তিক্ত আকাশ

তিক্ত আকাশ

কাজী সাইফুল ইসলাম

প্রকাশনার এক দশক

তিক্ত আকাশ
উপন্যাস
কাজী সাইফুল ইসলাম

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৩

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com
web : www.ittadigranthoprokash.com

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

অক্ষরায়ন
বন্ধু কম্পিউটার্স
২৮/সি-২ টয়েনবি সার্কুলার রোড, মতিঝিল, ঢাকা।

ছাপাখানা
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
১০/১ বি কে দাশ রোড, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা

মূল্য
২০০ টাকা

Tikto Akash by Kazi Saiful Islam, Published by Ittadi Grantha Prokash : February 2013. Price Tk. 200, ISBN: 984 70289 0293 7

উৎসর্গ

জহিরুল আবেদীন জুয়েল
আদিত্য অন্তর

তৃণমূলে পড়ে থাকা সু-সাহিত্যগুলোকে তুলে ধরতে
নিরন্তর কাজ করে চলেছেন যারা

১

শ্রাবণের শেষ। এখনো বর্ষা তার সমান আগ্রাসী দাপটে খেলছে প্রকৃতির মাঝে। মৃত্তিকার গভীর অন্ধকারে জড়িয়ে থাকা বৃক্ষ-মূল হতে শুরু করে সকল প্রাণী যেন অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। দুরন্ত মেঘেদের ছোটাছুটি, কখনো একটানা বৃষ্টি আবার কখনো থেকে-থেকে বায়ুতাড়িত জলকণার উৎপাত চলতে থাকে সারা দিন রাত ধরে। উনুনে জ্বলে-জ্বলে কাঠ কয়লার মতো কালো মেঘেরা যেন বিশাল বুনো-কালো মানুষের অবয়বে আড়াল করে রাখে সূর্যটাকে। সকালকে সন্ধ্যা আর মধ্যাহ্নকে গভীর রাত মনে হয় এই ঘুণ্টিঘর বস্তিতে।

চারদিকে এঁদো অন্ধকার, গায়ে-গায়ে মেশানো ঘিঞ্জি ঝুপড়ি, অসহ্য নোংরা, কাঁচা পায়খানা, দুর্গন্ধ, পাতলা টিন বা মোটা পলেথিনের কাগজে তৈরি ঘরের চালাগুলোতে হাজারো ছিদ্র। স্যাঁতস্যাঁতে পানি জমা মেঝে, চাটাই আর হোগলা পাতার বেড়ায় ধরে থাকে পচন। আর মানুষের সাথেই পোকামাকড়ের ঘরবসতি। রোগ-শোক নিত্যকার আর নিত্যকর্মের মাঝেই চলে মৃত্যুর আলিঙ্গন।

শীত, গ্রীষ্মের সাময়িক ছুটিটুকুও নেই এই ঘুণ্টিঘরে। আছে নিরন্তর মৃত্যুর হাতছানি। কফিন আর অসহ্য ধবধবে সাদা কাফনের কাপড়, ধুপকাঠি আর আতরের গন্ধে মৌ-মৌ করে চারিধার। গন্ধ বয়ে নিয়ে চলা সরু ধোয়াগুলো খানিকটা উপরে উঠেই মিলিয়ে যায় অসহিষ্ণু বায়ুতে। শবযাত্রা শুরু হয় গলির মুখ থেকে, এ যেন লাশের মিছিল। শত কণ্ঠ ধনিত হয়, 'আসহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাহ্হু মুহাম্মাদুর রাসুলউল্লাহ্ (সা.)'।

এরই মধ্যে চলে জীবনের সকল আয়োজন। আলো ফোটার সাথেই ছুটতে হয় রুদ্ধশ্বাসে। চোখে অসহ্য যন্ত্রণা। রাতে ঘুম হয় না পুলিশগুলোর উৎপাতে। শুধুই উৎপাত। বাঁশিগুলোর অশান্ত হুইসেল বড় কর্কশ আর অমানবিক। কি এমন খোঁজে এই নোংরা ঘুণ্টিঘরে, ওরাই জানে। দলে-দলে

মানুষ ছুটতে থাকে কারখানায়, জুতার দোকানে, রিকশা নিয়ে, অনিশ্চিত দিনমজুরিতে। প্রতি সকালে রিকশার গ্যারেজে শুরু হয় অশ্রাব্য গালাগালি। বেলবাটি চুরি গেছে। শিশুদের কানে তুলো গুঁজে দিয়েও শান্ত হতে পারে না ওদের মায়েরা। মুখে ভেঙচি কাটে। ব্যটাছেলেদের মুখ খুব খারাপ। বেলা বাড়তে থাকে। ঝালমুড়ি আর বাদাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ে অল্প বয়সি ছেলেরা। গলির মুখে এসে বসে কাঠি দেয়া আইসক্রিম আর কাঠি বিহীন কুলফি।

বিকেলের শেষ ভাগে ঘুণ্টিঘরে ফিরতে থাকে সবাই। মুখে কালিঝুলি, ছিন্নবস্ত্র, মলিন আর ক্লান্ত অবসাদে নুইয়ে পড়া শরীর। বুকের খাঁচাগুলো উঁচু করে নিঃশ্বাস ফেলে, কালো রোগা মানুষগুলোর চোখের কোণে লেগে থাকে রাগ, যেন জীবনের উপর উগ্র আচরণ। সারা দিনে হাড়ভাঙা খাটুনির সঞ্চিত সবটুকু বাংলা মদের দোকান আর কাচের গ্লাসে চুমুক দিয়ে যেন ঔদ্ধত্য প্রকাশ।

বিরতিহীন খিস্তি করে চলে কচি কোমর ছেলেমেয়েরা। যেন অপভ্রংশ, অশ্রাব্য ছাড়া আর কিছুই শেখার নেই এখানে। ক্ষুধার জ্বালায় করছে অযৌক্তিক সব আচরণ। তার পর বালিশে মুখে গুঁজে অসার হয়ে পড়ে থাকা। যেন একটি দিন পার হলো। এভাবে কতদিন যাবে, কতদিন বেঁচে থাকতে হবে তাও অজানা। তবুও একটি দিন পার হয়, এটাই যেন স্বস্তি।

আজ কারখানা থেকে ফেরার পথে বাংলা মদের ঝুপড়িতে ঢুকলো সিকান্দার। ভাট্টিখানা থেকে মাল এনে ঘুণ্টিঘর বসে বিক্রি করে সম্রাট। মোটা পয়সা কামায়, তবে ভাগ দিয়ে খুব বেশি টেকে না ওর। পুলিশের ভাগ, মাস্তানদের বখরা আরো কত কি।

কথায় কথায় সম্রাট বলে, কোনো পুঙ্গির পুতেরে যদি বখরা দিতে না হইত, তয় কবেই যাইয়া ভদ্দোলোকের পাড়ায় বাড়ি বানাইতাম।

আজ কারখানায় গোগুগোল করে এসেছে সিকান্দার। সব রাগ মদের গ্লাসে মিটিয়ে পকেট ফাঁকা করে টলতে-টলতে কোনো রকমে শরীরের তাল রেখে দরজায় এসে হাঁক দিলো, এই মাগী গেলি কই। দুয়ার খোল।

যেন আকাশ থেকে একটি বাজ পড়ালো মরিয়ম বেগমের মাথায়। আজও গিলে এসেছে। জায়নামাজ থেকে উঠে দৌড়ে গিয়ে দরজা খুলে দিয়ে বলল, এ কি চাল আনেন নাই। এক গোটা চালও নেই ঘরে। না খেয়ে মরবে না কি সব!

ওমনি হুঙ্কার দিল সিকান্দার। মাগী ভদ্দ কতা কইবি না। দুই ক্লাস পইড়া ভদ্দ কতা .. অ্যাঁ। না খাইয়া মর, সব।

www.banglainternet.com

বলেই এক ঝটকায় মরিয়ম বেগমকে বেড়ার কাছে ফেলে দিয়ে তক্তাপোষের উপর গিয়ে বসলো সিকান্দার। এই বৃষ্টির মধ্যেও সমানে ঘামছে সে। জোরে-জোরে নিঃশ্বাস নিয়ে পকেট থেকে একটি বিড়ি বের করে দু'আঙুলের ডগায় খস খস করে ঘসে নিয়ে জ্বালিয়ে লম্বা টানে ঘর ভরে দিতে লাগলো ধোঁয়ায়।

আজ যেন কিছুটা শক্ত মরিয়ম বেগম। সিকান্দারের সামনে দাঁড়িয়ে বলল, কি সব ছাইপাস গিলে টাকাগুলো উড়িয়ে দিয়ে এলেন। এখনো মাসের অর্ধেক টা বাকি...

আর যেন তর সইল না সিকান্দারের। তরাক করে তক্তাপোষ থেকে নেমে এসে চুলের মুঠি ধরে এক টানে পাটিতে ফেলে দিল মরিয়মকে। তার পর মরিয়মের হালকা নিতম্বে লাঠি কষে বলল, শালি মাগী, আমার টাকায় আমি মাল খাই, তোর বাবার কি? তোর বাবার টাকায় খাই না, আমার পয়সায় খাই... হাঁপাতে হাঁপাতে লাঠি খুঁজতে শুরু করলো সিকান্দার। আইজ তোরে জন্মের ঘরে দেহামু।

লাঠি খুঁজে না পেয়ে আবার এসে বসে তক্তাপোষের উপর। তার পর পায়ের কাদা নিয়েই সটান করে শুয়ে পড়ে চোখ বন্ধ করে সিকান্দার।

সেদিনের মতো বেঁচে যায় মরিয়ম বেগম। দু'দিন আগে লাঠি দিয়ে মেরে তার কপাল ফাঁটিয়েছে। রক্তে লাল হয়ে গিয়েছিল সাদা কাপড়টা। এখনো দগদগে ঘা। আজ লাঠি পেলে কপালে কি ছিল আল্লাহ্-ই জানেন।

ঘরে ঢুকলো রুদ্র। চোখ লাল, মুখে সিগারেটের গন্ধ। এইটুকু ছেলে গাঁজা টানতে শুরু করেছে। আড়চোখে ছেলেকে দেখলো মরিয়ম বেগম। স্কুল পাস করে কি হলো। কলেজে যাচ্ছে, লাভ কি হবে? সেই বাবার মতোই মদ ধরবে আর পাড়ার ছেলেদের সাথে খিস্তি-খাস্তা করবে।

বাবার দিকে একবার তাকিয়ে নিজের মনেই রুদ্র বলল, আইজকা মনে হয় মালে ধরছে। তারপর নিজের মনে ঈষৎ হেসে হাত-পা না ধুয়েই খেতে বসেলো সে। যেটুকু খাবার ছিল সবটুকু খেয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল, খুব খিদা লাগেছিল।

তার পর আবার ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ে রুদ্র। ছেলের দিকে নির্বিকার তাকিয়ে থাকে মরিয়ম বেগম। ছেলেকে কত কি বলার ছিল। কিন্তু কিছুই বলা হয় না। আর কতোই বা বলবে। এত বছর ধরে তো নাকে কানে কম বোঝানো হয়নি তাকে। নিজের মধ্যে বুঝ না এলে, বুঝালে লাভ হবে না। ছেলেটির মাথা ভালো ছিল। একটু পড়লেই মনে থাকে। ক'দিন পরেই

কলেজের পরীক্ষা। বই ছুয়েও দেখছে না রুদ্র। বুকের ভেতর অব্যক্ত এক ব্যথা নিয়ে সিকান্দারের পাশে গুটিশুটি হয়ে শুয়ে পড়লো মরিয়ম।

আলো ফোটার আগেই ঘুম ভাঙল সিকান্দারের। উঠেই এক হুংকার। এখনো ঘুমাচ্ছিস মাগী। নাস্তা দিবে কেডা? আমার কি আর একটা মাগী আছে, কারখানায় যামু না!

অকস্মাৎ ঘুম থেকে লাফিয়ে উঠলো মরিয়ম। চোখের কোণে লেগে থাকা জলের দাগ শুকায়নি এখনো। চোখে জল নিয়েই কখন যেন ঘুমিয়ে পড়েছিল। দ্রুত উঠে রুদ্রর ঘরে চলে এলো মরিয়ম। এখনো বেঘোরে ঘুমাচ্ছে রুদ্র। সারা রাত ধরে তৈলহীন সলতেটা জ্বলে-জ্বলে ডিমা আলোয় এখনো জ্বলছে হারিকেনটা। বুকের উপর পড়ে আছে বই। রাতে হয়তো পড়েছে রুদ্র। তাতে মন খুশি হয় না মায়ের। কাপড় ঠিক করে দ্রুত গিয়ে জ্বালিয়ে দেয় কেরোসিনের উনুনটি।

কিন্তু ঘরে যে এক মুঠ আটাও নেই। নাস্তা হবে কি করে? এই প্রশ্নটিও স্বামীকে করার সাহস হলো না তার। সব সময় ভয়ে কুচকে থাকতে হয়। কারণে অকারণে গায়ে হাত তোলে। আল্লাহ্ যে কেন পুরুষের সমান শক্তি দিয়ে গড়েনি নারীকে তা বুঝতে পারে না মরিয়ম? আর পুরুষের যদি শক্তি দিলই তবে মনটা কেন নারীর মতো দিল না? প্রকৃতির নীলা কে বোঝে! মার খেয়ে সব সময় মনটা যেন ছোট হয়ে থাকে নারীদের। সভ্যতার ঊষালগ্নে রোম, গ্রীকের দাসদের মতো।

গত রাতে কিছুই খাওয়া হয়নি মরিয়মের। থর-থর করে কাঁপছে সারা শরীর। প্রাত্যহিক কাজ সেরে গোসলের জন্য বাইরে লাইনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে সিকান্দার। আজও পানি পড়ছে টিপ-টিপ করে। সিটি করপোরেশনের দু'টি মাত্র কল পুরো বস্তিতে। তার উপর পানির জন্য রাস্তায় নামতে হয় মাঝে-মাঝে। সরকার যে কি কাজটা করবে মানুষের জন্য বোঝা সারা। পানিটাও ঠিক মতো ব্যবস্থা করতে পারে না জনগণের জন্য। এবার ইশতেহারে কত কি বলে ক্ষমতায় এলো আওয়ামী লীগ। তার কোনো বাস্তবায়ন নেই। শুধু কথার ঝুড়ি।

হেঁশেল থেকে দ্রুত পায়ে ঘরে এসে নিজের শরীরটা তক্তাপোষের তলায় ঢুকিয়ে দিল মরিয়ম বেগম। তার পর টেনে বের করলো পুরাতন একটি টিনের কৌটা। বেশ কিছু খুচরা পয়সা আর কয়েকটি এক টাকার নোট। নিজে না খেয়ে জমিয়েছিল পয়সাগুলো। সেখান থেকে দশটাকা গুনে নিয়ে, রুদ্রকে ডেকে তুলে বলল, ধলুর দোকান থেকে খুচরা আটা কিনে আনবি।

www.banglainternet.com

আজকাল ছেলের সাথে খুব একটা কথা হয় না মরিয়মের। এতো কষ্ট করে পড়াতে পাঠিয়েছিল ছেলেকে। স্কুল পাস হলো, ক'দিন পরে কলেজ পাস হবে। তবুও যেন কোনো পরিবর্তন নেই। বাবার মতোই হবে। এখন গাঁজা ধরেছে, কদিন পরেই মদ ধরবে।

যে ক'টি রুটি হলো, আখের গুড় দিয়েই তার অর্ধেকের বেশি সাবাড় করে দিল সিকান্দার। বাকি রুটির মাত্র একটি মায়ের জন্য রেখে সব ক'টি খেয়ে নিল রুদ্র। বহু কষ্টে খাচ্ছে সে। এসব আর ভালো লাগে না তার। টাকা রোজগার করতে হবে। কালা, বিলুদের মতো মাস্তান হলেও লাভ ছিল। মা যে কেন তাকে স্কুল, কলেজে পাঠালেন, তা কিছুতেই মাথায় আসে না তার। টাকা রোজগার করলে অন্তত না খেয়ে থাকতে হতো না।

অবশিষ্ট রুটিখানা খেয়ে পেট পুরে পানি খেয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল মরিয়ম। আজ যেন একটু বেশিই ব্যথা করছে কপালের কেঁটে যাওয়া অংশটায়। লাঠির আঘাতে থিতলে গেছে উপরের চামড়া। এক ফোটা ঔষধ খেতে পারলে হয়তো ভালো লাগতো। কিন্তু...

ছেলেটির জন্য খুবই কষ্ট হয় তার। এখন আর কথা শুনতে চায় না। কথা বললেই উল্ট বোঝে। মায়ের উপরেই যেন তার সব রাগ। কেনো তাকে পড়তে পাঠালেন তিনি। বস্তির ছেলেদের সাথে মিশে তাদের মতোই হয়ে গেছে ছেলেটি। এবার কলেজ পাশ দিলে ঘুণ্টিঘর থেকে একটু দূরে রাখতে হবে রুদ্রকে। শুয়ে-শুয়ে ভাবতে থাকে মরিয়ম।

রোদ উঠেছে। মেঘ ভাঙা রোদের তেজ খুব বেশি। তবুও শস্তি এলো মনে। ঘণ্টা দুয়েক একটানা রোদ পেলে সব শুকিয়ে যাবে। কিন্তু চারিপাশের এঁটো-পচার গন্ধটা তীব্র হয়ে উঠবে রোদের তাপে। বাইরে দাঁড়িয়ে কে যেন ডাকছে রুদ্রকে। এই রুদ্দ, রুদ্দ বাইরে আয়।

গায়ে কাঁটা দিল মারিয়মের। নামটাও ঠিক মতো বলতে জানে না। সবগুলো হারামির একশেষ।

দাঁড়া আইবার লাগছি।

আরো বেশি তিক্ত হয়ে উঠলো মরিয়মের মনটা। এই যে কালা আর বুলেট এসেছে। শার্টের বোতাম লাগিয়ে জামার আস্তিন গোটাতে-গোটাতে বেরিয়ে গেল রুদ্র। লোমতোলা কুকুরটার ঘেউ-ঘেউ বিকট চিৎকার। নির্ঘাত কুকুরটাকে লাথি মেরেছে কালা। ছেলেটি বদের হাড্ডি। কুকুরকেও ছাড়ে না। মানুষ কুপিয়ে মারে! পুলিশ ওর বন্ধু!

রুদ্র বলল, কি রে এই সক্কালে?

হাসে কালা, অব্বে হালায় কয় কি, অহনো সক্কাল আছে নিহি?

বুলেট বলে, মাম্মা চলো নতুন ধান্ধা মিলছে।

রুদ্র বলল, কলেজে যাইতে হইবো।

কালা বলল, আরে গুরু তোমার কলেজের ঐহানেই যামু।

একটু যেন ঘাবড়ে গেলে রুদ্র। কালা তাকে গুরু কয়! এই বস্তির টপ রংবাজ কালা। সবাই ওরে গুরু কয়, কিন্ত সে কেনো... না কি কথার কথা।

এই ব্যাটা কি ভাবছস? বলল কালা।

না। কিছু না। ধান্ধাটা কি?

বুলেট বলে, তুমি আমাগো লগে থাকলে ভালো হয় গুরু।

আরে ব্যাটা ধান্ধাটা কইবি তো?

আওয়ামীলীগ অফিসে যামু।

চোখ যেন কপালে তুললো রুদ্র। ক'দিন আগেও ওরা বিএনপি'র চেলা ছিল। আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর ওরা বের হতে পারে নি ঘুণ্টিঘর থেকে। এখন আবার যাবে আওয়ামী লীগের কাছে। রুদ্র বলল, ক্যান, তোরা না...

হাসে কালা। গুরু তুমি তো এই লাইনে নতুন আইছ। বুঝবা না। তুমি আমাগো লগে থাকলে দেখবা। তোমার মতো নেখাপাড়া জানলে, আসমানে উইড়া বেরাইতাম।

কিন্তু দল পাল্টাবি ক্যান?

আমাগো আবার দল কি? ধান্ধা হইলেই হইল। তার পর দৃঢ়কণ্ঠে কালা বলল, ধান্ধায় না পোষাইলে বড়-বড় নেতারাও দল ছাড়ে। এখন আওমীলীগ পাওয়ারে। তাগো লগে না গেলে না খাইয়া মরতে হইবো। বুঝলা।

হতভম্ভ হলো রুদ্র। জীবনে অনেক কিছুই শেখার আছে। তবে বিলু, অমল, ঝন্টু ওরা ও কি ওদের মতো করবে। কালাদের চেয়ে অনেক ছোট রুদ্র। কিন্তু বাড়ন্ত শরীর, বড়দের মতো দেখায়। তাছাড়া লেখাপড়া জানে। তাই ওকে দলে টানতে চায় সবাই।

কথায়-কথায় গলির মুখে এসে ধলুর চায়ের দোকানে বসলো ওরা। কালাকে দেখেই ঝটপট উঠে অন্য দিকে চলে গেল কয়েকটি ছেলে। ধীরে-ধীরে কাছে এলো নুরু। তের-চৌদ্দ বছর হবে। গোটে রেগ দিতে শুরু করে। এরই মধ্যে কালাদের অনুসারি হয়ে গেছে। ছালামালাইকুম গুরু?

হাত নাড়ে কালা।

কতা আছিল গুরু?

www.banglainternet.com

পরে। এহন কাম আছে।

কথা না বাড়িয়ে মাথা নিচু করে চলে গেল নুরু।

পুরোন দিনের গানের একটি রেকর্ড বাজছে ধলুর দোকানে, মধুমালতি ডাকে আয়, ফুলো ফাগুনের এ খেলায়। যুথি কামিনি কত কথা গোপনে বলে...।

এরই মধ্যে নারায়ণগঞ্জ থেকে আসা ট্রেনটা তীব্র হর্ন বাজিয়ে বস্তির ঘরগুলো কাঁপিয়ে দ্রুত ছুটে গেল গেণ্ডারিয়া স্টেশনের দিকে।

কালা বলল, হালার ট্রেন আহার সময় পাইল না। এই ধলু গানডা আবার বাজা। তার পর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল, নতুন সেট কিনছস নিহি?

সন্ত্রস্ত হাতে গানটি রিপ্লে করে দিয়ে ধলু বলল, হ ভাই।

চা দে?

দুই কাপ চা তিনজনে ভাগ করে খেয়ে বুলেট বলল, গুরু বিলু পুঙ্গির পুতে মনে হয় নয়া ধান্ধা পাইছে।

একটি গোল্ডলিফ সিগারেট জ্বালিয়ে কালা বলল, বহুত সেয়ানা হইয়া গেছে। যাইবো কই। বস্তি ছাইরা তো আর যাইতে পারবো না।

এরই মধ্যে একটি রিকশা এসে থামলো ধলুর দোকানের সম্মুখে। ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নামলো চুমকি। পরেছে আটপৌরে কাপড়, মলিন মুখ। বুলেট তাকিয়ে আছে চুমকির দিকে। সেই সাথে কালাও। বুলেট বলল, গুরু চুমকি না কি লাইনের মাইয়া...।

রুদ্র বলল, ফালতু কতা কইবি না। শাহবাগে ক্লিনিকে চাকরি করে।

তুমি বুজবা না গুরু। সব হইতাছে গিয়া ভুয়া। বুচ্ছ নিহি। তুমি বুঝবা না।

কালা আর বুলেটের দৃষ্টি অনুসরণ করতে লাগলো রুদ্র। ওদের এই ব্যাপারটা একেবারেই ভালো লাগে না তার। মনে হয় সে যেন ওদের চেয়ে একটু ভিন্ন। ওদের লোভী চোখ চুমকির ভারি নিতম্বর দিকে। যেন খুন চেপে গেছে ওদের মাথায়। ছিঁড়ে খাবে। খিঁচিয়ে উঠে দাঁতে-দাঁত চেপে কালা বলল, মাগীর দেহডা... চিপায় পাইলেই তেল ভাংঙ্গুম।

কিছু রাগি কণ্ঠে রুদ্র বলল, কি রে এই হানেই বইয়া থাকবি নিহি?

তখনো চুমকির যাবার পথে তাকিয়ে আছে কালা। অপ্রকৃতিস্থ হয়ে বলল, না বে, ল কামে যাই।

ওরা উঠলো। এরই মধ্যে বস্তির ভেতর থেকে বিশাল একটি মিছিলের মতো চিৎকার, চেচামেচি, হাহাকার, উল্লাস করে বেরিয়ে আসছে গলির মুখে।

গলিমুখ থেকে ভিতরে পা বাড়াতেই মিছিলটির মুখে পড়লো চুমকি। ছেলে-বুড়ো, নারী-পুরুষ সব এক সাথে। এই জটলার অর্থ অজানা নয় এখানকার মানুষগুলোর। কালা বলল, ঐ রুদ্দ দেখ না বে, কেডায় জানি...

এরই মধ্যে ভিড় ঠেলে বেরিয়ে এলো চুমকির ছোট ভাই। এসে বলল, ঐ আপা মা ফিট খাইছে।

মুহূর্তেই অসহায়ের মতো এদিকে ওদিকে তাকাতে লাগলো চুমকি। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। কেউ-কেউ চলে এলো ধলুর দোকানের সম্মুখে। সবার মুখেই, চুমকির মা ফিট পড়ছে।

প্রায় দৌড়ে গলিমুখে চলে এলো চুমকি। ওর বুকের কাপড় পড়ে আছে রাস্তায়। যুবক, বুড়ো প্রত্যেকের চোখ ওর বুকের উপর। যেন অত্যন্ত লোভনীয় স্বর্গীয় কোনো মাংসপিণ্ড। অথবা টসটটে পাকা কোনো নরম ফল। মানুষগুলোর দৃষ্টি অসহায় ভঙ্গিতে অনুসরণ করে চুমকির ছোট ভাই। অসহ্য লাগে। তার পর বোনের ওড়নাটা রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিয়ে বলে, ঐ আপা। এই নে। বুকে জড়া।

কালা বলল, ঐ রুদ্দ সিএনজি পাম্পে যাবি নিহি?

ক্যান?

ঐহাইনে গ্যালে গাড়ির জোগাড় হইবে।

ল।

চুমকি চলে গেল ভিতরে। রুদ্র ওকে বলল, আমরা গাড়ি নিয়ে আসছি। রেললাইন পার হয়ে সিএনজি পাম্প থেকে একটি গাড়ি নিয়ে এলো ওরা। এখনো ভিড় গলেনি গলিমুখ থেকে। গাড়ির পিছু নিয়ে ছুটছে ছোট-ছোট ছেলে মেয়েরা। সরু রাস্তায় এতো লোকের ভিড় গাড়ি যেতে পারছে না ভিতরে। কালা নেমে এলো গাড়ি থেকে। খিস্তি করে বলল, এই হারামির বাচ্চারা সব সইরা যা, নয় খবর আছে কাইলাম।

মুহূর্তেই গলে গেল ভিড়টা। গাড়ি এসে থামলো চুমকিদের ঘরের সামনে। রুদ্র ঢুকলো ভিতরে। চুমকির বাবা মাটিতে বসে সমানে হাঁপাচ্ছে। বুকের হাড়গুলোর উপর ছড়িয়ে আছে পাতলা পুরাতন তেলহীন কালো চামড়া। হাঁপানির ধাত আছে তার। খুব কষ্ট করে শ্বাস নিচ্ছে সে। রুদ্র বলল, তোমার বাবাকে ঔষধ দাও চুমকি। না হলে সেও অসুস্থ হয় পড়বে।

চুমকি সচেতন হলো। দ্রুত ঘরে গিয়ে বাবাকে ঔষধ এনে দিয়ে দাঁড়ালো মায়ের কাছে। ভিড় যেন কিছুতে কমছে না। এবার চিৎকার করলো বিলু, এই হালারা সব বাইরে যা কইতাছি।

www.banglainternet.com

সংজ্ঞাহীন হয়ে মেঝেতে পড়ে আছে চুমকির মা। মোটা মানুষ। তোলা কষ্ট হবে। রুদ্রর চোখ পড়লো মায়ের দিকে। মাথায় কাপড় টেনে দোয়া পড়ে ফুঁ দিচ্ছে চুমকির মায়ের মাথায়। মায়ের কপালের দাগটা দগদগে ঘায়ের মতো দেখাচ্ছে। বুকের ভেতরটা যেন কেঁপে উঠলো রুদ্রর। বাবা শালাটা এক্কেবারে ফালতু, শুধু মাল গিলবে আর মাকে মারবে।

ধরাধরি করে গাড়িতে তোলা হলো চুমকির মাকে। কিন্তু কে যাবে তার সাথে, টাকাই বা কে দেবে। কালা বলল, ঐ চুমকি টেকা লইয়া গড়িতে উঠ। গাড়ির ভাড়া দিতে হইবো না, কিন্তু ডাক্তার...।

মাথা নেড়ে চুমকি জানালো ওর কছে টাকা নেই।

চোখ বড়-বড় করলো কালা। কি কইবার লাগছস। টেকা নাই, মরবো নিহি?

বাবার দিকে তাকালো চুমকি। কোনো সাড়া না পেয়ে ছুটে গেল অন্য ঘরে। শেষ পর্যন্ত শ'দুয়েক টাকার জোগাড় করা গেল কয়েক ঘর ঘুরে। কিন্তু এতো সব ঘটলো কি করে? শোনা গেল কে যেন সকালে এসে চুমকির ব্যপারে কিসব বলে গেছে তার বাবাকে। তা নিয়েই চুমকির বাবা আর মায়ের মধ্যে তুমুল ঝগড়া। তারপর বাবা চুল ধরে মাটিতে ফেলে কোঁকের উপর লাথি কষতেই জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন মা।

ভ্রুকুটি করে চুমকির বাবার দিকে তাকালো কালা। হালার গায়ে তো এক ছটাক মাংসও নাইকা। এত শক্তি আহে কইথিকা।

এরই মধ্যে কে যেন ডাক্তার নিয়ে এসেছে। গলির উল্টো দিকে ডাক্তার সাহেবের চেম্বার। ঘুণ্টিঘর বস্তির একমাত্র ভরসা তিনি। সময়-অসময়ে এই ডাক্তারই কাজে লাগে সবার। ডাক্তার সাহেব এসেই ভিড় সরিয়ে ঝুকে পড়লো গাড়ির মধ্যে। নাড়ি টিপে, যন্ত্র দিয়ে বুক পরীক্ষা করে, চোখের পাতা টেনে মলিন মুখে বললেন, উনি আর নেই।

তারপর ব্যাগটা নিয়ে চলে যাচ্ছিলেন ডাক্তার, টাকার কথা বলল রুদ্র।

ডাক্তার বললেন, মৃতের কাছ থেকে ফি নেই না আমি।

মুহূর্তেই খবরটা ছড়িয়ে গেল সব জায়গায়। চুমকির মা মরেছে রে চুমকির মা মারে গেছে। খবরটা শুনে চুমকির বাবার বুকের খাঁচাটা উঠা-নামা করছে সমান তালে। চোখে জল ঝরছে। স্ত্রী বিয়োগের ব্যথা আর একটি ভয়। পুলিশের ঝামেলা হবে। শালারা তো সুযোগ পেলেই ঝামেলা করবে।

মায়ের পাশে বসে বিলাপ করে কাঁদেছে চুমকি। ভাইটি দাঁড়িয়ে আছে

পাশে। কালা আর রুদ্র আলোচনা করতে লাগলো পুলিশের ব্যাপারটা। এখানে সারাক্ষণ টিকটিকি ঘোরে। সুযোগ পেলেই ঘা বসিয়ে দেবে। বিলুসহ কয়েকজনে মধ্যে বলে দেয়া হলো ব্যাপারটা। মুহূর্তেই পুরো ঘুণ্টিঘরে ছড়িয়ে পড়েলা, হাঁপানির দোষে মরলো চুমকি মা। গরিব, ঔষধ কিনে খেতে পারেনি।

কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে নুরু বলল, রুদ্দ ভাই চুমকির মা না কি পটল তুলেছে।

চুপ হারামির বাচ্চা। এক থাবড়ে ভোলো পালটাইয়া হালামু। কথাটা বলল, কালা।

নুরু যেন হতভম্ব হয়ে গেলো। সে বুঝতে পারলো না তার ভুলটা কি হলো। কিন্তু কালা ভাই বলেছে, তাই চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল একপাশে। একটি চাদর এনে ঢেকে দেয়া হলো চুমকির মায়ের শরীর। চলে গেল গাড়িটা। এখন দাফনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কালা বলল, ল চান্দা লইতে হইবো।

কিন্তু ...

কিন্তু ক্যান?

রুদ্র বলে, হারুন ভাইর কাছে যাবি...

যা বে, এহন বিএনপি ক্ষমতায় নাই। হারুন ভাই ডাণ্ডা দেহাইবো।

ক্যান ডাণ্ডা দেহাইবো। তোরা না হ্যার লাইগা কত কি করলি। জেলেও গেলি দু'বার। র‍্যাবের ক্রস থেইকা আল্লাহ্ বাঁচাইছে।

কালা বলল, ল ফিরোজ লিডারের কাছে যাই।

বিলু বলে, এহন হ্যারে ভি পাওয়া যাইবো না। কতায়-কতায় ছিম বদলায়। আওয়ামী লীগের বড় নেতা। দল ক্ষমতায়, বুচ্ছস না।

কালা বলল, ঐ বিলু তুই না কি আওয়ামী লীগের কাছে যাইয়া কুত্তার মতো লেজ নাড়ছ।

বিলু তাকালো কালার দিকে। তার পর বলল, কি কইবার চাস সোজাসুজি ক।

কালা বলল, বেশি বাড়িস না বিলু, হাতি মরলেও বোলে লাখ টেকা। বি এন পি ক্ষমতায় নাই, তয় মইরা গেছি নিহি...

বিলু বলল, হ জানি। সব খবরই আছে। বুচ্ছস না। তোরে তো নতুন নেতারা চায়। আওয়ামীলীগে এহন নেতার অভাব নাই, দল ক্ষমতায় থাকলে কাউয়ার অভাব পড়ে না। বুচ্ছস না।

www.banglainternet.com

রুদ্র চড়াও হলো ওদের উপর। এই ব্যাটারা, মানুষ মরছে, যত তাড়াতাড়ি দাফন করা যায় ততই ভালো। আর তোরা... আরে গুরু এইসব পরে ভাবা যাইবো। এক লগেই কাম করতে হইবো। নইলে কিছুই পাওন যাইবো না।

বিলু বলল, ঠিক কইছো গুরু।

টাকা যোগাড় করতে নেমে পড়লো ওরা। কোথায়ও পাওয়া গেল না টাকা। শেষ পর্যন্ত কালাকে যে নেতা দেখা করতে বলেছিল তার কাছে গেল ওরা। তিন হাজার টাকা দিল লোকটা। একটু করুণ কণ্ঠে দু'চারটি কথাও শুনিয়ে দিল। আর বলল, কালই যেন তার সাথে দেখা করে।

টাকা পেয়ে মোস্তফা মল্লিকের উপর দারুণ খুশি ওরা। এই শালার লগে থাকলে কাম হইবো। বড় ব্যবসা আছে হালার। দলের মধ্যে হালে উঠতে চায়। পোলাপাইন দরকার।

কাফনের কাপড়, আতর, ধুপকাঠি নিয়ে দ্রুত ঘুন্টিঘরে চলে এলো ওরা। দুপুর হয়ে গেছে। বস্তির এক বৃদ্ধাকে দিয়ে করানো হলো অন্তিম গোসল। মসজিদ থেকে নিয়ে আসা হলো লাশ টানা খাট। জানাজা দিয়ে সোজা নিয়ে যাওয়া হলো জুরাইন কবরস্থানে।

শেষ পর্যন্ত চাঁদা তুলতে হলো না। বস্তির আশেপাশের দোকানদারগুলো ভীত হয়ে থাকে সব সময়। কখন চাঁদা দিতে হবে। কবরস্থানে ডোমেদের সাথে পরিচয় আছে কালার। কালাকে দেখে একজন এসে বলল, আরে কালা ভাই। কেমন আছেন। মরা লইয়া আছেন?

হ। সন্ধ্যার আগেই ব্যবস্থা কইরা দে।

সন্ধ্যার আগেই মাটি দেয়া হলো। মাগরিবের আজান হয়ে গেছে। তখনো পশ্চিম আকাশে সূর্য তার অস্তিত্ব রেখে চলেছে গভীর রক্তিম প্রভায়। নতুন এক সমাধি রচনা হলো এই বিশাল কবরস্থানে। চুমকির চোখে কান্না জড়ানো হতাশা আর অন্তরের অন্তিম থেকে বিসাদিত বিলাপ ভারি করে তুললো প্রবাহমান বাতাস। প্রকৃতির সব চলাচল বন্ধ হয়ে নিরন্ধ্র এক শূন্যতায় ভাসতে লাগলো পৃথিবী।

বিদায়ের এই কষ্ট যেন অসহ্য হতে-হতে কষ্টের রূপ ঢাকা পড়লো গভীর হতাশা আর অনন্ত মায়ায়। একটি লোকও যেন নেই চুমকিকে সান্ত্বনা দেবার। রুদ্র গিয়ে চুমকির হাতটি ধরে হালকা চাপ দিয়ে বলল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকো না। বাড়িতে যাও।

রুদ্র অবিষ্কার করলো সে শুদ্ধ বলতে পারে, ঠিক কলেজের ছেলে

মেয়েদের মতো। কান্নাভরা চোখে রুদ্রর দিকে এক পলক তাকিয়ে হাঁটতে শুরু করলো চুমকি।

ঘুন্টিঘর এসে সোজা সম্রাটের দোকানে ঢুকলো ওরা। আজ মাল খাবে ওরা। সব খরচ করেও বেশ কিছু টাকা পড়ে আছে পকেটে। এর একটি সঠিক ব্যবস্থা করা দরকার। কালা বলল, ল মাল খাইতে হইবো আইজকা।

রুদ্র বলল, টেকা পাইবি কই?

ক্যান, চুমকির মায়ের লাইগা...

কথা শেষ না হতেই রুদ্র বলল, মরার টেকা দিয়া মাল খাবি নিহি?

খামু। কি কইবার লাগছস ব্যাটা। হগল কাম তো ছ্যাস হইয়া গেছেগা। চল বে আর দেবি করিস না। ঐ বিলু এই ল, একশ' টেকার কাষা মাংস আর রুটি বি লাইয়া আয়।

একশ' টেকায় কি হইবো।

ল আর পঞ্চশ বি লাইয়া যা।

সম্রাটের ঝুপড়িতে ঢুকতে শরীর কাঁপছে রুদ্রর। এর আগে আর কখনো মাল খাওয়া হয়নি তার। কালাকে দেখেই সরু চোখে তাকালো সম্রাট। কালা বলল, এই সম্রাট ঠাণ্ডা পানি দে।

তোরা ভিতরে যাইয়া বয়।

ভেতরে গিয়ে বসলো ওরা। ঠাণ্ডা পানি আর সামান্য বরফ কুচি, মিশানো হলো মালের সাথে। খানিকটা ঠাণ্ডা হলে ঢোকে-ঢোকে গিলতে লাগলো ওরা। মাঝে-মাঝে মাংস আর রুটি খেতে বেশ ভালো লাগছে। চানাচুর হলেও মন্দ হতো না। তবে ঝাল মাংসের সাথে কোনো তুলনা নেই।

পর-পর তিন পেগ গিলেই লুটিয়ে পড়লো রুদ্র। বুক জ্বলে যাচ্ছে। জোর করে আরো দু'পেগ খাইয়ে দিল কালা। এবার পুরো আউট হয়ে গিয়ে গালাগাল শুরু রকলো রুদ্র, ঐ শালারা আমার বুক জ্বইলা গেল। বমি আইতাছে।

চুপ শালা। মাইরা ভোল বদলাই দিমু। চুপ কর।

সম্রাট বলল, ভালা পোলাডারে নষ্ট করলি কালা।

বেশি কতা কইস না কইলাম সম্রাট। ভালা আবার কোন হালায় রে। তুমি তো চান্দু মাল কামাইতাছো, আবার জ্ঞান দিতে আইছো?

উচ্চস্বরে সম্রাট বলল, পাটির মানুষরে টেকা দেই, পুলিশ কন্টোল করি, কোনো খানকির পুতেরে জিগাইয়া দোকান চালামু না।

মুহূর্তেই যেন রক্ত চড়ে গেল কালার মাথায়। দপ করে জ্বলে উঠে কালা

www.banglainternet.com

বলল, খিস্তি-খাস্তা করবি না কইলাম সম্রাট। তোর ঝুপরির মধ্যে তোরে কইলাম নাই কইরা হালামু।

মুহূর্তের মধ্যে নিভে গেল সম্রাট। ওদের সাথে লাগা ঠিক হবে না। বলল, আরে ধুর, চ্যাতো ক্যান গুরু। আমি কি তোমারে খিস্তি করছি নিহি। আমি তো সবাইরে জানাইয়া করি, কিন্তু কতা হইতাছে তুমি তো কোনো খবর রাহ না।

কি হইছে?

ডাইল, গাজা, হিরোইন, বাবা এহন ওপেন হইয়া গেছে। মাইরি, ওইয়া খাইলে মানুষ মরবো। আমার মালে বি মানুষ মরবো না।

বাবা কি বে?

ইয়াবারেই বাবা কইতাছে এহন।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিলুর দিকে তাকিয়ে থাকে কালা। ওর চাহনিতে ফুটে ওঠে প্রশ্ন। মুখে কিছুই বলতে হয় না। বিলু বলল, গুরু তোমারে সবই জানামু। পোলাপানে কিছু পয়সা রোজগার হয়। পুলিশের লগে কন্টাক আছে। কোনো ঝামেলা হইবো না। আর ডাইল, বাবা বস্তির পোলাপাইনে খাইতে পারে নিহি, এইয়া খায় সাহেবের পোলাপাইনে। মাইয়ারা বাবা-ডা খায় বেশি।

এক পাশে বুঁদ হয়ে পড়ে আছে রুদ্র। একটির পর একটি সিগারেট টানতে ভালো লাগছে তারা। বিলু, কালা ওর দিকে তাকিয়ে হাসে। হালায় তো সাধ পাইয়া গেছে।

রাত দশটার দিকে হন্তদন্ত করে ছুটে এলো নুরু। কালার দিকে তাকিয়ে বলল, গুরু বস্তিতে ফিরোজ ভাই আইছে। লগে পোলাপাইন, আপনেরে খুঁজতাছে।

স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতা ফিরোজ ভাই এসেছে বস্তিতে। সাথে কয়েকজন কর্মী। এখানে যে দলের নেতারাই আসে সবাই আগে খোঁজে কালা আর বিলুকে। তারা জানে কালা, বিলু ওরা কখনো কারো নয়। টাকা দিয়ে ওদের কাজ করানো যায়। কালা, বিলু ওরাও জানে কাজে না লাগলে কেউ আসবে না তাদের কাছে। তবে এখানকার নেতারা বস্তি হাতে রাখার জন্য কালা-বিলুদের হাতে রাখতে চায়। ওদের দিয়ে করানো যায় না এমন কোনো কাজ নেই। পুলিশের সাথে যেমন বন্ধুত্ব আবার পদে-পদে শত্রুতা ওদের। ওদের দিয়ে অনেক রকম ধান্ধা মেলে অনেকের। আর ওদের চলে নুনে-ভাতে।

বেরিয়ে এলো কালা, সাথে রুদ্র বিলু, অমল। জে ভাই কন।

গলা খেকিয়ে নিয়ে ফিরোজ ভাই বললেন, সকালে কি যেন বলেছিলি। কোন বৃদ্ধা মারা গেছে। খুব ব্যস্ত ছিলাম। ফোনে কি এইসব হয়। চল কোন ঘর।

লন ভাই।

ওরা চলে এলো চুমকিদের ঘরের সম্মুখে। মুহূর্তেই পঞ্চাশ-ষাটজনের একটি জটলা হয়ে গেল চুমকিদের ঘরের সমানে। থানার ডিউটি অফিসার এসে ছালাম দিল ফিরোজ ভাইকে। খুবই চমৎকার কথা বললেন তিনি। রুদ্রর চোখ ছানাবড়া। আরে এরা তো সব ভালো মানুষ। তয় কালা যে কইল, সব হালার হারামি! চুমকির হাতে নগদ দু'হাজার টাকাও দিলেন ফিরোজ ভাই। মৃত ব্যক্তির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য।

তারপর সবাইকে রেখে কালা, বিলুদের নিয়ে একটু পাশে চলে এলেন ফিরোজ ভাই। রুদ্রর দিকে চোখ পড়লো তার। ছেলেটি ওদের চেয়ে ভিন্ন। হাসি মুখে বলল, তুমি কে?

আমি রুদ্র। এখানেই থাকি।

কালা বলল, আমাগো বন্ধু। কলেজে যায়।

খুব ভালো। সাথে রাখিস।

আরো দু-একটি কথা বলে, তার সাথে দেখা করতে বলে বিদায় নিলো ফিরোজ ভাই। একটু পরেই বস্তিতে ঢুকলো বিএনপি-র হারুন চৌধুরী। ক'দিন আগেও তার কথায় চলতো এই বস্তি। দল সরকারে না থাকায় নিজের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তিনি। তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালো কালা। রুদ্র শুনছে তার কথা। দারুণ সব কথা বলছে। বস্তির মানুষের সব উন্নয়ন সে করে দেবে। তার দল আবার ক্ষমতায় আসলে এখানকার মানুষ না খেয়ে মরবে না।

বিলু আর কালাকে ধরলেন হারুন চৌধুরী। তোরা না কি আওয়ামী লীগের লোকের সাথে কাজ করবি?

হাসল কালা, ধুর, সব হালারা আমাগো ফাঁসাইতে চায়। বুচ্ছেন না।

তিনিও চলে গেলেন। ধীরে-ধীরে গভীর এক নির্জনতায় গ্রাস করলো পুরো বস্তি। চুমকির মা মরে গিয়ে ওদের হাতে কিছু টাকা দিয়ে গেলেন। ছোট ভাইটা বলল, ঐ আপা কাইলকা মাংস আনবি। কতদিন মাংস খাই না।

হাতের টাকাগুলোর দিকে তাকিয়ে ডুকরে উঠলো চুমকি। সে রাতে আর ঘরে গেল না, কালার ঝুপরিতে গিয়ে অসার হয়ে শুয়ে রইল রুদ্র।

www.banglainternet.com

২

সময়টা যে এতটা অস্থির আর অবিবেচক হবে তা কখনোই বুঝতে পারেনি মরিয়ম। সিকান্দারের সাথে বিয়ে হয়েছিল অদ্ভুতভাবে। তখনো স্কুলে যায় মরিয়ম। কুরআন পড়তে পারে, সুরা মুখস্ত হয়েছে নামাজ পড়ার মতো। সিকান্দারের ফুপুর বাড়ি ছিল মরিয়মদের একই গ্রামে। সেখানে বেড়াতে এসেছিল সিকান্দার। স্কুলে যাবার পথে একবার শুধু দেখেছিল মরিয়মকে। তার পরেই পয়গাম নিয়ে এসেছিল। দু'দিনের মধ্যেই বিয়ে।

বাবাও যেন বেঁচে গিয়েছিলেন। তখন নিজের ভাত জোটাতেই কষ্ট ছিল বাবার। তার উপর যুবতী মেয়ে। তার যদি একটি ব্যবস্থা না করা যায়, তাহলে মরেও শান্তি নেই তার। কার হাতে রেখে যাবেন। বিয়ের পর বছর খানেক বাবার বাড়িতেই থাকতে হলো মরিয়মকে। যৌতুক না দিলে মরিয়মকে গ্রহণ করবে না সিকান্দার। নবযৌবনা নতুন অক্ষত পুষ্ট দেহটার যেন সবই জানা হয়ে গিয়েছিল সিকান্দারের। তাই হয়তো মরিয়মের উপর আগ্রহ হারিয়েছিল সে। আসলে সে হলো বহুগামি নষ্ট পুরুষ। এক দেহে মন বাঁধা পড়ে না বেশিক্ষণ।

কিন্তু মরিয়মের বাবারপক্ষে যৌতুক দেয়া সম্ভব ছিল। তিনি ছিলেন দিনমজুর। শেষ পর্যন্ত ইহলোক ত্যাগ করলেন বাবা। ফুপুর চাপে মরিয়মকে বস্তিতে এনে তুললো সিকান্দার। তার পর রুদ্র এলো বহু আশার আলো জ্বেলে। ছেলের মুখের দিকে চেয়ে স্বামীর সকল অন্যায়-অত্যাচার সহ্য করতে লাগলো মরিয়ম। ছেলে তার বড় হবে, মায়ের মনে সুখ এনে দেবে। কিন্তু সেই ছেলেটাই এখন...।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিছানা ত্যাগ করলো মরিয়ম। গত রাতে বাপ-ছেলে দু'জনেই বাইরে কাটিয়েছে। নিশ্চয়ই সেই মেয়েটির কাছে থেকেছে সিকান্দার। কিন্তু ছেলেটা কোথায় গেল। মদ ধরেছে নিশ্চই, না হলে রাতে ঘরে ফিরবে না কেন?

সারা রাত না ঘুমিয়ে মাথা ঝিমঝিম করছে এখন। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে মরিয়মের। কোনো রকমে উঠে দাঁড়িয়ে এক গ্লাস পানি খেয়ে নিল সে। এরই মধ্যে ঘরে ঢুকলো সিকান্দার। হাতে চটের ব্যাগ। মেঝেতে ছুড়ে ফেলে বলল, নে মাগী... এইবার মৌয়াতের খাওয়া খা।

দু'টি আলু গড়িয়ে গেল মেঝেতে। সেই দু'টি কুড়িয়ে নিচু মুখে মরিয়ম বলল, রাতে কোথায় ছিলেন?

ঐ মাগী তোরে কইতে হইবো?

একটু যেন জিদ চেপে গেল মরিয়মের। মার তো এখন নিয়ম করে খাচ্ছে, মুখ বুজে থেকেই লাভ কি। কেন বলবে না?

কি... হারামির বাচ্চা মুখে-মুখে তক্ক?

অমনি চুলের মুঠি ধরে মাটিতে ফেলে কোঁকের উপর এক লাথি কষিয়ে দিয়ে সিকান্দার বলল, গেছিলাম ঐ মাগীর কাছে। হ্যারে লইয়াই থাকমু। তোর কি আছে মাগী, খালিতো আমারে চুইয়া খাবি। ঐ মাগী আমারে তার শরীর বেইচা খাওয়াইবো। আমি ওরে লইয়াই থাকমু। সইরা যা চোখের বিষ।

কোকিয়ে উঠে দ্রুত হেঁসেলে গিয়ে ঢুকলো মরিয়ম। আর মার খেলে হয়তো মরেই যাবে। সিকান্দার চিৎকার করতে লাগলো, আমার আশা ছাইড়া দে মাগী। তোর পোলার অনেক নেকাপড়া হইছে। এখন মদ গাঁজা ধরছে। হেরে কামাইতে নামা।

নিশ্চুপ হেঁসেলে বসে আছে মরিয়ম। চোখের পানি যেন শুকিয়ে গেছে তার। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। ব্যথাটা যেন অসহ্য লাগছে আজ। কোঁকে হাত বোলালো মরিয়ম। এত ব্যথা কেন, হাড়টা ভেঙে গেল না কি!

সিকান্দারের চিৎকার চেচামেচিতে ভিড় জমে গেল ঘরের দরজায়। হুঙ্কার দিয়ে সিকান্দার বলল, কি চাস শুয়ারের বাচ্চারা, সিনেমা দেখতে আইছস, সব যা শালারা, তোর মায়গো...।

মুহূর্তেই গলে গেল ভিড়টা। ঘরে এসে ঢুকলো রুদ্র। বালতি আর গামছা নিয়ে চলে এলো কলতলায়। আজকাল আর লাইনে দাঁড়াতে হয় না রুদ্রর। সে এখন বস্তির মাস্তানদের মধ্যে একজন। সবাই তাকে সমীহ করে। এই ব্যাপারটা ভালোই লাগে তার। নিজেকে বেশ দামি মানুষ মনে হয়।

গোসল সেরে ঘরে চলে এলো রুদ্র। বাবা বেরিয়ে গেছে। মা এসে ঢুকলো ঘরে। বলল, তোর না পরীক্ষা?

হ।

ক'দিন বাকি আছে?

www.banglainternet.com

অল্প কয়দিন।

কলেজে যাবি না?

অহন আর যাইয়া কি হইবো। পরীক্ষা দিলেই পাস।

ঈষৎ হাসলেন মা। ঠোঁটের কোণে লেগে থাকলো বিদ্রুপ আর শ্লেষ জড়ানো কণ্ঠে বললেন, পাস তো করাই যায়, কিন্তু মানুষ হওয়া...।

মায়ের কথার অন্তর্নিহিত ভাব বুঝতে পারে না রুদ্র। সিগারেটের ধোঁয়া ওড়ানোর মতো বলল, ধুর, কি যে কও মা।

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে দ্রুত প্রস্থান করল মা। হেঁসেলে এসে বসলেন। বিষাক্ত মন আর ক্লান্ত শরীর। উনুনের আগুন জ্বালানো হলো বহু কষ্টে। একটানা বৃষ্টিতে নেতিয়ে আছে উনুনের পেট। শুকনো জ্বালানি জ্বালছে ধীরে-ধীরে। ভাতের হাঁড়ি উনুনে তুলে দিয়ে এক ধ্যানে শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সে।

উনুনের গর্ভে জ্বলতে থাকা শুকনো চিকন বাঁশের গিট ফাটা শব্দ আর আগুনের আঁচ লেগে মনটা ব্যাকুল হয়ে ওঠে মুহূর্তেই। সারাদিন ধরে কানে ভেসে আসে বস্তির লোমতোলা কুকুরগুলোর ঘ্যানঘ্যানানি আর ন্যাংটা ছেলে মেয়েগুলোর অশ্রাব্য বাক্য। ঘরে-ঘরে স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া, মারপিট আর অশান্ত ভালোবাসাহীন প্রতিরাতেই এক বিছানায় সহমরণ যেন প্রাত্যহিক কর্মে বাঁধা। এ যেন পার্থিব সময়ের মধ্যে অপার্থিব সব খেলা।

সবাই যেন অভ্যস্থ হয়ে উঠেছে এইসব নিত্যকর্মে। সেইসব থেকে কিছুটা আলাদা রাখার জন্য নিজে না খেয়ে ছেলেকে স্কুল-কলেজে পাঠিয়েছিলেন মা। সারা দিন স্কুলে থাকবে, এই নোংরা ছেলেমেয়ের সাথে মিশবে না। ভদ্রলোকের ছেলেমেয়েদের সাথে মিশে ভালো কিছু শিখবে। লোকে ভালো বলবে। মায়ের এই কষ্ট স্বার্থক হবে।

কিন্তু সবই যেন নিঃষ্ফল মনে হচ্ছে আজ। জীবনের কোনোকিছুই যেন পূর্ণতা পেল না তার। না স্বামী, না সন্তান। যে স্বামীকে অবলম্বন করে তার দীর্ঘ এই জীবন, সেই স্বামী জগৎ-এর সবচেয়ে পর হয়ে ধরা দিয়েছে জীবনে। অসৎ বাজারের সেই মেয়েটার কাছেই যেন তার সকল সুখ। হয়তো তাকে নিয়েই...। মেয়েটারই বা দোষ কোথায়? পেটের দায়ে অনেকেই শরীর বিক্রি করছে। সিকান্দার নিজেই চরিত্রহীন। মেয়ে মানুষের শরীর বিক্রির টাকায় খেতে চায়! ছি...। গা গুলিয়ে বমি আসতে চাইল মরিয়মের।

চাল ফোটার মুখে, বাষ্প ধরেছে পানিতে। বাষ্প উড়ে যেতে ঢাকনার মুখে ঠক-ঠক শব্দ করে যাচ্ছে বিরামহীন। সপ্রতিভ হয়ে হাতে আঁচল জড়িয়ে

ঢাকানাটা তুলে দিল মরিয়ম।

জীবনের এতগুলো বছর চলে গেল একটি পুরুষের দাসীগিরি আর অমানবিক নির্যাতন সহ্য করেই। তবুও এতদিন একটি সান্ত্বনা ছিল, মানুষটাকে আপনার বলে মনে হতো। কিন্তু আজ কেবলই মনে হয় সে যেন অনেক দূরের একজন মানুষ। অন্যের।

তবে কেন এই মিথ্যে প্রবঞ্চনা। কিসের আশায় পড়ে থাকা, এই বন্ধন কেন? কাটা হয়ে কেনই বা বেঁধে রাখা। তার চেয়ে ভালো মুক্ত থাকা আর মুক্ত করে দেয়া। দু'জনের মধ্যে একটি সেতু ছিল, রুদ্র। আজ সেও যেন সমস্ত বন্ধনহীন ছুটে চলেছে নিজের মতো।

যার মধ্যে বিন্দুমাত্র অনুভূতি নেই। রুদ্রকে মানুষের কাজে লাগাবার জন্য মানুষ বানানোর ইচ্ছেটা প্রবল ছিল মায়ের। কিন্তু আজকাল যেন সেই প্রবৃত্তিটাও প্রায় মৃত। কখন যেন সমাধিত হয়েছে তা নিজেই টের পায়নি মা। আসলে অদৃষ্ট আর বিধাতার বিধান অস্বীকার করা যায় না।

ভাতের মাড় ঝরাতে দিয়ে ডাল বসিয়ে দিল মরিয়ম। আজ কেন যেন মনটা অন্য স্রোতে প্রবাহিত হচ্ছে বার বার। কেন যেন একটি প্রশ্ন ধনুকের ফলার মতো এসে এফোড়-ওফোড় করছে অন্তর। সে কি নিজের বোঝা নিজেই বইতে পারে না? এত বছর ধরে এই সংসারের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে সে। অথচ নিজেই অন্যের বোঝা হয়ে পড়ে আছে চিরকাল। সংসারের যেমনি করে কাজ করে, সেই কাজটুকুই যদি অন্যভাবে করা যায়, তাহলে অন্তত কারো বোঝা হয়ে থাকতে হবে না।

ডালের ঢাকনা তুলে বাঁশের ঘুটনি দিয়ে ভালো করে ডাল ঘুটে পানির সাথে মিশিয়ে দিয়ে আবার যেন কোথায় হারিয়ে গেল মরিয়ম। কি কি কাজ করতে পারবে সে? নিজেকেই প্রশ্নটা ছুড়ে দিল তীব্রভাবে। নিজের সমর্থ সম্পর্কে পুরোপুরিই অজ্ঞ। শুধুই কি রান্না? জীবনের এতটা পথ বয়ে এসে এই অপরাহ্নে এতটা পার্থিব-নিষ্ঠুর হিসাব কষতে হবে তা কখনোই ভাবতে পারেনি মরিয়ম।

প্রভাত আর মধ্যাহ্নের কতগুলো সূর্যদীপ্ত সময় অতিবাহিত হলো শুধুই কি ভুল পথে। হয়তো অদৃষ্ট, নয়তো অজ্ঞতার কারণেই ঘটলো এতোটা ভুল। যে সংসারে এতোটা বছর হাড় ভাঙা খাটুটি খাটলো বুকের রক্ত আর ভালোবাসা দিয়ে। সে যেন ফলহীন কর্ম হয়েছে তার।

আঁচলের খুটে অশ্রু আর নাকের ডাকায় ঝোলা পানি মুছে নিয়ে প্রিতৃপ্ত চোখে উনুনে জ্বলা আগুনে দৃষ্টি নিবন্ধ করে ভাবল, যে সময়টা গত হয়েছে

www.banglainternet.com

তাকে ভেবে সম্মুখের সময়গুলো মূল্যহীন করে দেবার কোনো মানে হয় না। তাছাড়া দু'বেলা খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

সিকান্দারের চোখের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, সে আর থাকবে না এই সংসারে। মানুষ যখন পতিত হতে থাকে তখন সে ছুটতে থাকে প্রবাহিত শক্ত স্রোতের মতো। যেন জলপ্রপাত। কোনো কিছুতেই বাঁধা যায় না তাকে। আর ছেলে, সেও তো পূর্ব-পূরুষের সমরূপ! যদিও বহু কষ্টে মায়ের গর্ভ ধারণে ভূমিষ্ট আর বহু আদরে অস্থি-মজ্জা পরিপক্ক হয়েছে তার।

চোখের সম্মুখে জ্বল-জ্বলে সূর্য কিরণ। উজ্জ্বল সূর্য কিরণ যেন মাতন তুলেছে মরিয়মের অন্তরে। সে তো আররিটা পড়াতে পারবে খুব ভালো করেই। ছিপারা, কুরআন পড়াতে কোনো সমস্যা হবে না তার। কচি-কচি কোমলমতি ছেলেমেয়েদের নতুন পবিত্র মনে বিধাতার শ্রেষ্ঠ বাণী রোপণ করে যাবে তাদের অন্তরে। তাতেই হয়তো ছড়িয়ে পড়বে আলো। সেই আলোয় আলোকিত হবে দেশ– সমাজ– বিশ্ব।

আর আদর্শলিপি ভালোই পড়াতে পারবে সে। চর্চা নেই বহুদিনের। রুদ্রর বাংলা বইগুলো অথবা বাংলা একটি পত্রিকা এনে যদি প্রতিদিন অনুশীলন করা যায়...। হ্যাঁ, তাই করতে হবে। বস্তির কয়েকটি ছেলেমেয়েকে পড়াতে পারলেই খাওয়ার ব্যবস্থাটা হয়ে যাবে তার। ছেলে বা স্বামী কারো বোঝা হয়ে থেকে নিজের অসম্মান আর নয়।

ভাতের মাড় ঝরে গেছে। গড় তুলে আলুগুলো থেকে ভাত ছাড়িয়ে নিয়ে ভর্তা বানানোর কাজে নিযুক্ত হলো মরিয়ম। কোনো নতুনের পিছু নিয়ে ছুটে চলেছে তার মন। এ যেন নতুন কোনো আনন্দ। মনের সব দুঃখ যেন উধাও হয়েছে তার। গভীর আধারের পরে আলো সুনিশ্চিত।

বেরিয়ে গেছে রুদ্র। সাথে কালা, বিলু, আলম আর বুলেট। ঘুণ্টিঘর বস্তি ছেড়ে রেললাইনের উপর দিয়ে হেঁটে দিননাথ সেন রোড ধরে সোজা রজনী চৌধুরী লেনে চলে এলো ওরা। এখানে ধনীদের বাস। ডিস্টিলারি রোড আর দিননাথ সেন লেনে বহু স্মৃতি রুদ্রর। প্রতিদিনই পা হেঁটে গেন্ডারিয়া স্কুলে আসতো সে। তার পর সোহরাওয়ার্দী কলেজে। আর পড়বে না সে। পড়ে কি হয়। বাপ শালাটার যে অবস্থা। মাকে মেরে হাড় ভেঙে দিচ্ছে। খাবার আনছে না ঠিকমতো। পড়া বাদ দিয়ে কাজে নামাই ভালো। কালা ওরা তো ভালোই আছে। ইচ্ছেমতো টাকা উড়ায়।

রজনী চৌধুরী লেনেই মোস্তাফা মল্লিকের বাসা। টাকার কোনো অভাব

নেই তার। লোকটিকে ঠিকমতো হ্যান্ডেল করতে পারলে আর চিন্তা থাকবে না।

ওরা গিয়ে দাঁড়ালো মোস্তফা মল্লিকের বাসার সম্মুখে। রুদ্র বলল, ঐ কালা একটা কল দ্যছনা হালারে।

কালা বলল, হালায় বহুত মালদার। দেখ না বে বাড়ির চেহারা।

তারপর সেল ফোনে কথা বলে নিয়ে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে কালা বলল, গুরু আইজ কিন্তু তোমারেই কতা কইতে হইবো। ভদ্রলোকের মতো কতা কইবা, পারবা না?

মাথা ঝাকালো রুদ্র। পারবো।

মিনিট পাঁচেক পর গৃহপরিচারক গোছের একজন লোক এসে ভেতরে নিয়ে গেল ওদের। গেইট দিয়ে ঢুকতেই চোখে পড়লো নতুন মডেলের বিএমডব্লিউ গাড়ি। গাড়িটি ভালো করে দেখতে লাগলো কালা। বাড়ির ভেতরটা সব যেন ঝকঝকে-তকতকে। কোথায়ও একটু ময়লা নেই। বাড়ির মানুষের কোনো সাড়া শব্দ নেই। চাকার-বাকর কাজ করে যাচ্ছে। কে একজন সবাইকে বলে দিচ্ছে কাজের কাথা। বোধহয় কেয়ারটেকার।

ঘরের ভিতরে ঢুকতেই মাথা এলোমেলো হলো ওদের। বাইরে থেকে বোঝাই যায় না ভেতরে এতটা বিলাসী জীবন এদের। মোটা নরম কার্পেটে আবৃত মেঝে, এয়ার কন্ডিশনের সুন্দর ব্যবস্থা, দামি সব গদি বসানো সুদৃশ্য চেয়ার। সুন্দর বাতি। সাদা শান্ত আলো ছাড়াচ্ছে, চোখে লাগছে একটুও।

ওদের বসিয়ে রেখে ভেতরে চলে গেল গৃহপরিচারক। এই সুযোগে সবার সাথে কথা বলে নিলো কালা। ওদের উদ্দেশ্য এক। ধান্ধা না হলে ওনাকে ঘেটে লাভ নেই। আবারো মনে করিয়ে দেয়া হলো, রুদ্র যেন ভালোভাবে কথা বলে। সে যে কলেজে পড়ে সেই বিষয় যেন বুঝতে পারে নেতা। দলে পড়ালেখা জানা একজন থাকলে দলের সম্মান বাড়ে।

মিনিট দশেক পরে এলেন মোস্তাফা মল্লিক। খুব বেশি বয়স নয়। তবে যতটুকু বয়স তার চেয়ে অনেক কম মনে হচ্ছে তাকে। দামি পাঞ্জাবী, পাজামা আর চটিতে দারুণ লাগছে। চোখে-মুখে অভিজাতের ছাপ। মূলত বনেদি ঘরের ছেলে ওনারা। এখন রাজনীতিতে নেমেছে ক্ষমতা, সম্মান আর টাকার ভিতটা আরো একটু শক্ত করে নেবে বলে। মালব্রো টেনে যাচ্ছে একটার পর একটা। মুখে কৃত্রিম হাসি।

অল্প বয়সী সুন্দরী একজন গৃহপরিচারিকা ট্রলি ঠেলে ঢুকলো এ ঘরে। বিভিন্ন রকমের খাবার সাজানো আছে তাতে। এক-এক করে টেবিলের উপর

www.banglainternet.com

খাবারগুলো রেখে দ্রুত প্রস্থান করলো মেয়েটি। কালার দৃষ্টি অনুসরণ করছিল রুদ্র। মেয়েটার দিকে তাকাচ্ছে উগ্র দৃষ্টিতে। হাত নেড়ে সবাইকে খেতে বললো মোস্তফা মল্লিক।

কালা বলল, আগে কতা কন নেতা।

হা-হা করে হেসে উঠলো মোস্তফা মল্লিক। বলল, তোমাদের মতো ইয়াং জেনারেশনের সমস্যা কি জানো? তারপর কারো উত্তরের অপেক্ষা না করে নিজেই বলল, তোমরা অল্পতেই অস্থির হয়ে ওঠ। আমি ভাই ব্যবসায়ী মানুষ। আমার চোদ্দগোষ্ঠী ব্যবসায়ী ছিল। আমার সাথে কাজ করতে হলে তো স্থির হয়ে কাজ করতে হবে। শোন ভাই, অস্থির হলে কোনো কাজে সফলতা আসে না। আগে খাও তার পরে কথা।

রুদ্র তাকালো লোকটার দিকে। বহুত শেয়ানা মাল। কথা বলতে হবে সাবধানে। কিছুটা সচেতন হলো সে। কিন্তু শুদ্ধ কথার অভ্যাসটা নেই। কখন যেন মুখ থেকে খারাপ কথা বেরিয়ে আসে...। মনে-মনে নিজেকে ঝালিয়ে নিতে চেষ্টা করলো রুদ্র। কালার মুখ ভার। যতটা মুরগি মনে করা হয়েছিল, ততটা মুরগি নয় সে। মুরগি হলে কি আর কোটি-কোটি টাকা কামাতে পারে।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে মোস্তফা মল্লিক বলল, আমরা রাজনীতি করি মানুষের জন্য। আমাদের সাথে সবাই কাজ করতে পারে।

রুদ্র বলল, সে কথা তো সবাই বলছে।

রুদ্রর দিকে তাকালো মোস্তফা মল্লিক। তুমি কি করো?

কলেজে পড়ছি?

কোন কলেজে?

সোহরাওয়ার্দী।

বা, এতো ভালো কথা। বস্তিতেই থাকো তুমি?

জ্বি।

খুব ভালো। পাশেই তো তোমাদের কলেজ। পাস করে জগন্নাথে ভর্তি হয়ে যাবে। সব ব্যবস্থা করে দেব।

কিন্তু আমার জন্য কেন করবেন আপনি?

কারণ বস্তিতে থেকেও তুমি এতদূর এসেছে। সুযোগ পেলে নিশ্চই আরো ভালো করতে পারবে।

কিন্তু আমরা তো দল করার ব্যাপারে কথা বলতে এসেছি। রাজনীতি কি ভালো?

কেন নয়? অবশ্যই ভালো। দলের নেতা কর্মীরা কি দেশের কল্যাণে আসছে না।

আমার মনে হয় যতটা কল্যাণ করছে, তার চেয়ে বেশি করছে অকল্যাণ আর রয়েছে স্বার্থপরতা।

একটু ভাবল মোস্তফা মল্লিক। এই যুগের ছেলে ওরা। যতই বস্তিতে থাকুক। নীতিকথা বলে ভোলানো যাবে না। তাছাড়া আজকাল সকলেই খুব সচেতন দেশের বিভিন্ন ব্যাপারে। রাজনৈতিক দলের উপর খুবই নেতিবাচক ধারণা রয়েছে মানুষের। মোস্তফা মল্লিক বলল, দেখো ভাই। আমি দল বদলে আওয়ামী লীগে এসেছি। তোমরা যদি আমার সাথে কাজ করতে চাও, তবে আমার সম্পর্কে সবই জানতে পারবে। একদিনে তো আর সব জানা বোঝা হয় না।

একটু ভাবল রুদ্র। এই তো বাগে এসেছে। হাসি মুখে রুদ্র বলল, আমরা অবশ্যই আপনার কাজ নিয়ে কথা বলতে চাই না। কিন্তু আমরা কি করে রাজনীতি করবো। আমাদের তো অর্থ নেই।

হাসলো মোস্তফা মল্লিক। রুদ্র ভাবল শালা আওয়ামী লীগে এসেছে স্বার্থ লোটার জন্য। কিন্তু মনের মধ্যে সব প্রশ্ন চেপে রইল। এতোসব বলে কি লাভ। ওনাকে দিয়ে কাজ হবে। অসৎ, দুর্নীতিগ্রস্ত লোক ছাড়া মাল কামানো যাবে না।

মোস্তফা মল্লিক বলল, আমি কিন্তু শুধুই রাজনৈতিক নেতাই নই। আমরা জাত ব্যবসায়ী। বুঝতেই পরছো, বহু দিক ঠিক করে রাখতে হয় আমার। কোনো ঘাটে টাকা ঢালতে হয় আবার কোনো ঘাট থেকে টাকা তুলতে হয়।

জ্বল-জ্বল করে উঠলো কালার চোখ। কাজ হয়েছে। কথা বলতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু কিছুই বলে না। কিসে কি হয়ে যায়। তার চেয়ে একজনেই কথা বলুক। তাছাড়া ভালোই চালাচ্ছে রুদ্র।

রুদ্র বলল, আমাদের কাজ চাই। বুঝতেই পারছেন খেয়ে বেঁচে থাকতে হবে।

এই তো বুদ্ধিমান ছেলের কথা। এতসব হিসাব দিয়ে কাজ কি বলো। আরে বাবা এদেশে লুট চলছে। তোমরা সেই লুটের জায়গা পর্যন্ত যেতে পারবে না। আমরা সব জানি। তুমি যদি বসে থাকো অন্য কেউ তোমার কাজটি করে যাবে। খোঁজ নিয়ে দেখগে কিভাবে লুট চলছে। শুধু কি নেতাদের দোষ? ঐ তো পাশেই বিদ্যুতে চাকরি করে, লাইনম্যান। ঢাকা শহরে বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনে থাকে। ছেলেমেয়ে আর বাসা খরচ মাসে কত জানো?

www.banglainternet.com

কম হলেও লাখ টাকা। এই টাকা কি সরকার দেয় তাদের? না। মানুষের পকেট কাটে। নিজেরটা নিজেরই আদায় করে নিতে হয়।

রুদ্র বলল, তাহলে তো কথা হয়েই গেল। কাজের সময় আমাদের ডাকবেন।

অবশ্যই। একটু বসো।

বলেই ভিতরে চলে গেল মোস্তফা মল্লিক। যখন ফিরলো তখন হাতে এক ব্যান্ডেল টাকা। তবে সব একশ' টাকার নোট। তাহলে হাজার দশেক হবে। রুদ্র হাতে নিয়ে পকেটে পুরে দিল টাকাটা। নেতা আশ্বাস দিল, যে কোনো প্রায়োজনে সে থাকবে ওদের সাথে। প্রয়োজনে সব পাবে ওরা। পুলিশ কোনো সমস্যা নয়। তাছাড়া টাকা আর ক্ষমতার গন্ধে পা চাটে পুলিশ।

ওরা বেরিয়ে এলো, সবাই খুব খুশি। বেশ টাকা পাওয়া গেল। আজই ভরপুর মাল টানা যাবে। বুলেট বলল, আইজ টগরের ঘরে যাবি নিহি বে। টেকা কিন্তু থাকে না, বুচ্ছ না।

হাসলো কালা। হ, ল যাই। বহুত দিন যাই না। শরীরডা ভার হইয়া গেছে রে। ল।

কিন্তু একটি শঙ্কা এসে গ্রাস করে রুদ্রকে। তার মন যেন কিছুতেই সায় দেয় না ওকে। এতগুলো টাকা পাওয়া গেল, কোথায় খুশি হবে...। কিন্তু কালাদের ঐ মেয়ে মানুষের নেশাটা মোটেই ভালো লাগে না রুদ্রর। টাকা ভাগ করে নিয়ে ঘরে চলে যেতে হবে।

টাকা ভাগ হলো। সবার উপর থেকে পাঁচশ' টাকা বেশি দেয়া হলো রুদ্রকে। টানা এক মাস ধরে পরীক্ষা চলবে। এই এক মাসে যেন ঘর থেকে না বের হতে হয় রুদ্রকে। কালার এক কথা। গুরু পাস তোমারে করতেই হইবো। তুমি জগন্নাথে ভর্তি হইতে পারলেই দেখবা আমাগো ধান্ধার অভাব হইবো না। তখন বড়-বড় ধান্ধা মিলবো।

টাকা নিয়ে চলে গেল যে যার মতো। সকলের মনেই আজ খুশি। ওনাকে দিয়ে কাজ হবে। যন্ত্রের প্রয়োজন হলে তাও পাওয়া যাবে। টাকা এনে মায়ের হাতে দিল রুদ্র। অতগুলো টাকা দেখে বিস্ময়ের যেন কোনো শেষ রইল না মরিয়মের। তাহলে গুণ্ডামী শুরু করেছে রুদ্র! মুহূর্তেই যেন মনের মধ্যে এক খণ্ড অস্থির কালো মেঘ জড়ো হলো মরিয়মের। আবার মনে হলো কঠিন বরফ খণ্ড জমেছে হৃদপিণ্ডে। তারই পরিব্যপ্তি ঘটেছে সারা শরীরে। নিজেকে যেন বড় অসহায় লাগছে। মনে হচ্ছে মেঘ ভাঙা সূর্যর প্রখর অসহ্য তাপে তেঁতে যাচ্ছে শরীর। সারা শরীরে ঘাম ঝরতে লাগালো মায়ের।

ছেলে যে এতটা নিচে নামবে তা ভাবতে পারেনি কখনো। মরিয়ম বলল, তোর টাকা আমি নেবো না। সরে যা আমার সামনে থেকে।

মায়ের কণ্ঠ ছিল কঠিন এবং দৃঢ়। কিছুটা অপ্রস্তুত হয়ে টাকা নিয়ে মায়ের সামনে থেকে সরে গেল রুদ্র। তারপর নিজের ঘরে এসে বসল বই নিয়ে। পরীক্ষার এই ক'টা দিন ঘর থেকে বের হবে না সে। কিন্তু মায়ের ব্যাপারটা বুঝতে পারে না রুদ্র। না খেয়ে থাকাতে হয়, বাবার কাছে বকা খেতে হয় সব সময়। তবুও টাকা দেখে কেনো এমন করলেন মা। বই হাতে নিতেই মনটা শান্ত হলো রুদ্রর। সবই পড়া। এখন শুধু পুরোন পড়াগুলো রিভিশন দিতে হবে।

মা গিয়ে বসে রইল রান্না ঘরে। নিজেকে যেন কিছুতেই সংবরণ করতে পারছেন না। এলোমেলো সব ভাবনার পিছু ছুটে হাঁপিয়ে উঠেলেন মা। এতোসব ভেবে তার লাভ কি। নিজের মতো চলতে হবে। স্বামী, সন্তানের কর্মে রাগ বা খুশি হওয়ার কোনো মানে নেই।

উঠে চুমকিদের ঘরে চলে এলেন মরিয়ম বেগম। দু'দিন ধরেই কাজে যচ্ছে না চুমকি। উনুনও জ্বলছে না এ ঘরে। ছোট ছেলেটি শুকনো মুড়ি চাবাচ্ছে আর ঘরের দরজায় কুৎসিত মূর্তি হয়ে বসে আছে চুমকির বাবা। অপরাধীর মতো তার দু'টি চোখ। নিজের বৌকে মেরে ফেললো। এই বয়সে খুনি হতে হলো তার।

সেই একই অপরাধ যেন জড়িয়ে আছে চুমকির মনে। তার জন্য মরতে হলো মাকে। কে কি বলে গেল তার জন্যই বাবা মেরে ফেললো মাকে। শরীর যদি বিক্রি হয়েই থাকে, তা হয়েছে ক্ষুধার জন্য। নষ্টামিতো করেনি কারো সাথে। বাবা, মা যদি চোখের সামনে না খেয়ে মরতে থাকে, তাহলে এই শরীর দিয়েই কি হবে। ক্ষুধার জন্য না হয়ে যদি শরীরের জ্বালা মেটাতে দেহ দিতো পুরুষের কাছে, তাহলে না হয় সব মেনে নেয়া যেতো। সবই জানা আছে তার। ভদ্রলোকেরা ঘরে বৌ রেখে মেয়েমানুষের কাছে যায়, আবার ঘরের বৌ-রাও অন্য পুরুষের বিছানায় রাত পার করে। তাদের তো ভাতের অভাব নেই। তারা কেনো যাবে?

তারপরেও তাদের কোনো দোষ নেই। যত দোষ গরিবের। জীবনে অনেক দেখা আছে তার। বড়লোকের বৌদের শরীর ম্যাসাজ করতে গিয়েই তো এই লাইনে নামতে হয়েছে। কোনো তো উপায় ছিল না। নষ্ট পুরুষের দৃষ্টি সব পুড়িয়ে ছাই করে দেয়। কত সুন্দরী সব বৌ রেখে অন্য মেয়েদের শরীর লাগে তাদের। এক শরীরে তাদের মন ভরে না। তাদের টাকা দিয়েই

www.banglainternet.com

তো পেটের ভাত জোটে চুমকির মতো অনেকের। সখে তো আর মধ্য বয়সি বদমাইশ ব্যাটাদের সাথে শুতে যায় না কেউ। পেটে ভাত থাকলে কার সখ হতো ঐসব নোংরা বেটাতের সাথে...।

মরিয়মকে দেখে শোয়া থেকে উঠলো চুমকি। মরিয়ম বললেন, এভাবে মন খারাপ করে বসে থাকলে কি পেটে ভাত জুটবে। মা তো চলেই গেল, এখন না খাইয়ে বাবাকে মারবি না কি। ছোট ছেলেটার মুখটা শুকিয়ে গেছে।

ডুকরে উঠলো চুমকি। আমার কিছুই ভালো লাগে না চাচি। আল্লাহ্ আমাদের দেখে না।

চুমকির মাথাটা মায়ের বুকের সাথে চেপে ধরে বলল, কাঁদতে নেই। শক্ত হতে হয়। ভেঙে পড়লে যে না খেয়ে মরতে হবে। আমাদের কি শোক করার অবসর আছে রে। ক্ষুধার শোকে সব যেন ভুলে গেছি আমরা।

তার পর চুমকিকে রেখে নিজের ঘরে চলে এলেন মা। চার পায়ার নিচ থেকে পুরাতন টিনের কৌটাটি বের করলেন। এখন আর টাকা জমাতে ইচ্ছে হয় না তার। কাজের সন্ধান পেয়ে গেছে। জমা টাকা দিয়ে কি হবে। রোজগার করতে হবে। বহুকাল তো গৃহপালিত হয়ে থাকতে হলো। নির্বোধের মতো পুরুষের গৃহপালিত হয়ে আর কতকাল থাকবে।

চুমকির ঘরে এসে ওর হাতে টাকা তুলে দিলেন মা। সাহস দিতে লাগলেন তিনি। কোনো ভয়, অন্যায় করিস না। দেখবি আল্লাহ্ কোনো বিপদে ফেলবে না। তোর কাছে যে টাকা আছে তা দিয়ে মিলাদ পড়িয়ে দে।

কথা শেষ হতেই যেন ক্ষেপে গেল চুমকি। কিসের মিলাদ চাচি। এতিম, মিসকিনদের খাওয়ালে মায়ের আত্মা শান্তি পাবে? আমাদের চেয়ে মিসকিন আর কে আছে বলেন?

চুমকির দিকে তাকিয়ে রইল মরিয়ম। ওর চোখে ভয়ঙ্কর এক বিদ্রোহ আর সমাজের রীতি ভাঙার স্রোত। এই স্রোতে যেন ভেসে যাবে জগৎ সংসারের সকল অন্যায়। মায়ের চোখের মধ্যে বেজে উঠলো রণশিঙা। যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি। এতো যুদ্ধই। অনন্ত কালের যুদ্ধ। ক্ষুধা আর ভঙ্গুর গণতন্ত্রের, অপশাসন, ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে।

৩

সেদিন সন্ধ্যায় শুরু হলো ঝুম বৃষ্টি। সারা দিন মেঘলা আকাশ আর প্রবল বায়ু প্রবাহ। ধীরে-ধীরে বাড়ছে বৃষ্টির প্রকোপ। চারিদিকে বিমূর্ত অমূর্ত, যেন অদ্ভুত এক ঘন অন্ধকারে ঢাক পড়েছে ঘুণ্টিঘর। মাঝে-মাঝে বজ্রপাতে অদ্ভুত এক চিত্র ফুটে উঠছে পুরো বস্তিজুড়ে। মনে হয় যেন ছাই রঙে আঁকা বিবর্ণ ঘন-বৃষ্টি মাখা রাতের কোনো তেলচিত্র।

কিছুতেই বৃষ্টিকে রোধ করতে পারছে না মরিয়ম। জীর্ণ বেড়া আর ঘরের চালার ছিদ্র অনুসন্ধানে নির্ভুল উত্তরীয় ঝটিকা, সাথে বৃষ্টি এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে বিছানা-পত্র, স্যাঁতস্যাঁতে মেঝে কাদা হয়ে গেছে। তবুও শেষ রক্ষার জন্য খালি হাঁড়িগুলো এখানে-ওখানে ছড়িয়ে রখেছে মরিয়ম। বিদ্যুৎ চলে গেছে সেই কখন। শুকনা একটু জায়গা খুঁজে নিয়ে গুটিসুটি হয়ে বসে হারিকেনের আলোয় চলছে বাংলা পড়ার অনুশীলন। আজকাল রুদ্রর ঘর থেকে বাংলা বই এনে লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়েন তিনি। দিব্যি পড়তে পারছেন। এখনো ভোলেননি অক্ষরগুলো আর বানানের নিয়ম। এখন পড়তে বেশ ভালো লাগছে, প্রথম কয়েক দিনের তুলনায়।

অকস্মাৎ ঝাপি ঠেলে ঘরে ঢুকলো সিকান্দার। হাতে ভাঙা একটি ছাতা, পুরো শরীর ভেজা। মাথাটা বেঁচে আছে কোনোরকমে। হাতে একটি কাপড়ের ব্যাগ আর চোখে অপরাধের ছাপ।

কোনো কথা না বলেই নিজের কাপড়গুলো এলোমেলোভাবে দ্রুত পুরতে লাগলো ব্যাগে। বইটি আঁচলের তলে গুজে হতভম্বের মতো দেখতে লাগল মরিময়। এই বৃষ্টির মধ্যে...।

ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল সিকান্দার। মরিয়ম বলল, কোথায় যাচ্ছেন?

অমনি তেড়ে এলো সিকান্দার। ঐ মাগী তোরে কইতে হইবো। ঐ খানকি, চোখের বিষ, তর লাজ্জ নাই। আমার লগে কতা কস। সইরা যা মাগী।

www.banglainternet.com

ঈষৎ হাসলো মরিয়ম। ঠোঁটের কোণে ভেসে উঠলো করুণা, বিদ্রুপ আর চোখে অসহায়ের ছাপ। অদ্ভুত শান্তকণ্ঠে মরিয়ম বলল, এতোদিন এক সাথে ছিলাম। অন্তত বলে যান। আমি তো আর আপনাকে ঠেকাচ্ছি না।

তয় হোন। আর থাকমু না এই নরকে। আমি যাইতাছি।

সেই মেয়ে মানুষটাকে নিয়ে যাচ্ছেন।

হ। ওরে বিয়া করছি। তোরে তাকাল দিলাম।

বলেই বির-বির করতে-করতে সেই ঝড়-বাদলের মধ্যেই বেরিয়ে গেল সিকান্দার। কেন যেন দিশেহারা মতো লাগছে মরিয়মের। কি যেন হারালো আজ। কেন যেন ফাঁকা লাগছে বুকের ভেতর। আহত হয়ে কি যেন খুঁজতে লাগালো বুকের ভেতর। কিন্তু উপলব্ধি নেই কোনো। কেন এই বেঁচে থাকা? তাহলে সবই কি ভুল, মিথ্যে না কি খেলা? যে চলে যাবার, যা কিছু হারাবার তা যেন চিরকালই হারায় অনিবার্যভাবে। বাঁধা যায় না— না মায়ায়, না শিকলে।

তবুও যেন প্রবোধ মানতে চায় না মন। এতোদিনের সংসার। যেন অদ্ভুত এক মায়া লেগে আছে পুরোনো এই ঝুপড়িটি আর ঐ উগ্র লোকটির সাথে। এই ঘরেই জন্ম হয়েছে রুদ্রর। সে বেড়ে উঠেছে। কত সুখ-দুঃখের বাঁধনে বাঁধা এই ঘর তার সাথে লোকটি। বুকটা ফেটে উঠলো অদৃশ্য এক অভিমানে।

গত একমাস ধরে দিন-রাত পড়াশুনা করে পরীক্ষা দিয়েছে রুদ্র। মা জানেন নিশ্চই ভালো রেজাল্ট করবে তার ছেলে। তবুও যেন খুশি হতে পারেনি মায়ের মন। কি হবে লেখাপড়ায়, যদি মানুষই না হলো। একটি অমানুষ শিক্ষিত হলে দেশের বেশি ক্ষতি। তার অশিক্ষিতই থাকা উচিৎ। এই যে এতো বড়-বড় দালান কোঠার মধ্যে থাকছে ধনী মানুষগুলো। তাদের অনেকেই শিক্ষিত। বড় চাকরি করে। কিন্তু তারা কি মানুষ হতে পেরেছে? যদি মানুষ হবে তাহলে এভাবে নির্বোধের মতো চুরি করে কি করে। তাদের জন্যই দেশটা নিচের দিকে যাচ্ছে দিনে দিনে। শুনেছি লেখাপড়া শিখলে মানুষের বোধের জাগরণ ঘটে। কিন্তু এদেশে লেখাপড়া শিখেই যেন বড় নির্বোধ, স্বার্থপর, অমানুষ হয়ে ওঠে। এ দেশে শিক্ষিত লোক দ্বারা দেশ এবং সাধারণ মানুষ যতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, অশিক্ষত লোক দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম। শতকরা হিসেবে শিক্ষিত লোকেরা ক্ষতি করছে প্রায় নব্বই ভাগ আর মাত্র দশ ভাগ করছে অশিক্ষিত নিরক্ষর লোকেরা। একজন উচ্চ-শিক্ষিত উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী দেশ এবং জনগণের টাকা লুটে নিচ্ছে খুব

সহজেই, এয়ারকন্ডিশন রুমে বসে দামী কলমের খোঁচায়। আর একজন অশিক্ষিত লোক কি করছে? হয় চুরি-ডাকাতি নয়তো মাস্তানি। তাতে দেশের কি এমন ক্ষতি হচ্ছে বুঝতে পারি না। আর এইসব চুরি-ডাকাতি হচ্ছে ঐসব সুদখোর, ঘুষখোরদের কারণেই। না হলে দেশে টাকা লুট হতো না। সবারই কর্ম থাকতো, পেটে ভাত থাকতো। কিন্তু আশ্চর্য! এইসব বড়-বড় চোরদের কোনো শাস্তির নজীর নেই। বরং সমাজের মাথা হয়ে বসে আছে তারা। বসে আছে ঠিকই, কিন্তু চোর চোরই। ওদের চোখে মুখে যেন লেগে থাকে শঙ্কা। যে কোনো সময় জনতার আদালতে হতে পারে ওদের বিচার। আর বিধাতা সে তো চির অন্তরযামী। তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে না। ঈশ্বর সবার জন্য সমান।

সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে পাষাণ লোকটা। আর ফিরবে কিনা কে জানে। হয়তো আর ফিরবে না। তাকে দেখার ইচ্ছে হলেও দেখা যাবে না। একটি ছবিও নেই ঘরে। শুধু স্মৃতির পটে আঁকা। স্মৃতি থেকে মুছে গেলেই যেন সব শেষ। কিন্তু স্মৃতি থেকে কি মুছে ফেলা যাবে অন্তিম দিন ছাড়া?

বুকের ভেতর হু-হু করে জলোচ্ছ্বাস, আবার অনাবৃষ্টিতে মাটি ফেটে চৌচির। রাত বাড়ছে তার সাথে বাড়ছে বৃষ্টির প্রকোপ। মনে হয় যেন কোনো শবযাত্রা থেকে এসেছে মরিয়ম। ভয়ে যেন কুঁচকে যাচ্ছে সে। মন আর শরীর দুই-ই মলিন জীর্ণ প্রাণহীন হয়ে পড়ে আছে। হারিকেনের ডিমা আলোয় নিজেকে ফিরে পেতে প্রাণপণ চেষ্টা করছে মরিয়ম।

একমুঠ চালও নেই ঘরে। কাল সকালে কি হবে তার ঠিক নেই। ভাবনার জাবর কেটে কেটে স্থির হলো মরিয়ম। যে চলে গেছে, যাক। সে যদি সুখী হতে পারে তবে তার কেন এতো হা-হুতাশন। এই পৃথিবীর অনেক মানুষের ঘরেই চাল নেই। অনিশ্চিত জীবন তাদের। বিধতাই তাদের একমাত্র ভরসা।

অকস্মাৎ ঝাপি ঠেলে হুড়মুড়িয়ে ঘরের ভেতর ঢুকলো রুদ্র। সারা শরীর ভেজা, দু'পায়ে যেন ভর রাখতে পারছে না শরীরটার। বড় কষ্ট করে টলতে-টলতে এসে ধপাশ করে বসে পড়লো তক্তপোষের উপর। প্রায় চিৎকার করে উঠলেন মরিয়ম বেগম, কি হয়েছে? ক'দিন আগে কালা বিলুরা গোণ্ডগোল করেছে। সেই জন্য হয়তো রুদ্রকে আজ মেরেছে ওরা।

কিন্তু সব ভুল। নেশা জড়ানো কণ্ঠে বলল রুদ্র, এই মা ভাত দে।

মুখ থেকে বগবগিয়ে বাংলা মদের তীব্র গন্ধ। নাক কুঁচকে গেল মায়ের। যতটা না রাগ হচ্ছিল তার, তার চেয়ে বেশি হচ্ছিল করুণা। মন ভরে যাচ্ছিল

www.banglainternet.com

বিষাদে। আহা! এই ছেলে না কি তার গর্ভের ধন। মাতাল হয়ে ঘরে ফিরেছে এই বয়সে। মাতলামি করছে মায়ের সাথে।

আর কোনো কথা বলতে পারল না রুদ্র। ভেজা কাপড় নিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়লো। ভাত চেয়েছিল, খেতে পারল না। অনেক চেষ্টা করেও জাগানো গেল না তাকে। ওর গায়ের জামা ধীরে-ধীরে খুলতে লাগলো মা। তার পর একটি লুঙ্গি জড়িয়ে দিয়ে বহু কষ্টে টেনে খুলে দিল ছেলের জিন্স প্যান্ট। সেই ছোট বেলার মতো। যেমনি করে... তবুও কিছুটা অস্বস্তি। ছেলে হলেও গায়ে পুরুষের গন্ধ। শুকনো গামছা দিয়ে মাথাটা মুছিয়ে দিতে গিয়ে হু-হু করে কেঁদে ফেললেন মা।

অদৃষ্ট মানুষের সাথে এভাবে খেলতে পারে, নিজের জীবনে না ঘটলে হয়তো কখনোই বিশ্বাস করতেন না মরিয়ম বেগম। মনে পড়ে সেই ছোট বেলার কথা। কি সুন্দর সবুজ, প্রজাপতি আর ঘাস ফড়িং। লাতা-পাতা আর শিউলী, শেফালী, হাসনাহেনা। বকুল, জুঁই আর কাঁঠালী চাঁপা। দিগন্তের পর দিগন্তে, দৃষ্টি যেন চির বন্ধনহীন উদার। ছোটাছুটি কোলাহল।

সে জীবন মিলিয়ে গেছে বহু আগে। দম বন্ধকরা এই বস্তিতে দিনের পর দিন অনাহার অবহেলা, এই কি কষ্টের পুরস্কার! ক্ষুধার আর নিষ্ঠুরতার সাথে নিরন্তর যুদ্ধ।

প্রচণ্ড বৃষ্টি তার সাথে হাওয়া বইতে শুরু করেছে। পাশে ছোট-ছোট গাছের ডালা আছড়ে পড়েছে মনাদের টিনের চালে। কিন্তু কোনো কিছুতেই যেন উদ্বেগ উৎকণ্ঠা নেই মরিয়মের। তার অন্তরের ভেতরে প্রবাহিত ঝঞ্ঝার কাছে সব যেন ম্লান হয়ে যাচ্ছে নীরবে। আজ যতই ঝড় উঠুক, উড়িয়ে নিয়ে যাক সব। কিছুই যেন আসে যায় না তার। স্বামী চলে গেছে আর কোলের কাছে অচেতন হয়ে পড়ে আছে নিজের সন্তান। যাকে গর্ভে ধরে রেখে পৃথিবীর আলো দেখিয়েছিল সে। ঝড়ে হয়তো মাথার উপরের চালাখানা উড়িয়ে নিয়ে যাবে। তাতে কি এমন ক্ষতি হবে তার। আজ যা হারাতে হলো, তার চেয়ে অমূল্য যে আর কিছুই নেই সংসারে।

রাতে তেমন ঘুম হয়নি মায়ের। ছেলের পাশে বসেই একটু ঝিমিয়ে নিয়েছেন কোনো রকমে। ছেলেটা যেন বমি করার জন্য চেষ্টা করছিল বার-বার। ঘোরের মাঝে বলছিল, আর খাবো না, দিস না। ফজরের আজান কানে যেতেই উঠে বাইরে এলো মরিয়ম। ঘুণ্টিঘরের সরু গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে মাতাল হয়ে খিস্তি করে যাচ্ছে নজু আর বৌটাকে ইচ্ছেমতো পেটাচ্ছে বাদল।

আজ বোধহয় হাত-পা বেঁধে নিয়েছে বৌটার। মাঝে-মাঝে হাত-পা বেঁধে মুখে গামছা ঢুকিয়ে বৌটাকে পেটায় বদমেজাজি বাদল। ভাত দিতে পারে না, কিন্তু বৌ পেটাতে খুব ওস্তাদ। এই ফজরের ওয়াক্তেও মুখে অশ্রাব্য ভাষা। মাগী শরীর খাটাইয়া ভাত খাইতে পারছ না। রূপ তো আছে। ভালো দাম দিবো তোরে।

ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দু'টির চিৎকারে আর যেন দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না মরিয়ম। দ্রুত ছুটে গেলেন। তাকে দেখে মাথা নিচু করে অপরাধীর মতো দাঁড়ালো বাদল। রুদ্রর মা হিসেবে এই বস্তিতে খুব সম্মান তার। হয়তো ভয়েই সম্মান করে মানুষ। এটা ভালো লাগে না তার। কিন্তু এখন কেউ-কেউ ভালোবেসেও সম্মান করতে শুরু করছে। পাড়ার ছেলেমেয়েদের আরবি পড়ানোর কাজ করছে মরিয়ম।

বৌটার হাতের বাঁধন খুলে দিল মরিয়ম। পুরো বস্তি ঘুমে বিভোর। কি বা করার আছে। এ তো নিত্যকার ঘটনা। আকাশ পরিষ্কার। সারা রাত ঝরে ঘেমের ছিটেফোটাও নেই কোথাও।

বাঁধন খুলে দিয়ে মরিয়ম বলল, এভাবে কি মানুষ মারে বাদল?

খানিকক্ষণ স্থির থেকে অকস্মাৎ কেঁদে উঠলো বাদল। তার পর হাঁপাতে-হাঁপাতে বলল, আইজ তিন মাস ধইরা বেতন দেয় না কারখানায়। কি করমু মরিয়ম বু। এই মাছুম বাচ্চাগো মুখে কি বিষ দিমু। খিদার জ্বালা যে আর সহ্য হয় না।

তার পর বৌয়ের হাত ধরে কাঁদতে লগালো বাদল। বেটা ছেলেদের এভাবে কাঁদতে দেখেনি মরিয়ম। বাদলের কান্না দেখে চোখে জল এলো মরিয়মের। আঁচলে চোখ মুছে বলল, যাও তোমরা ঘুমিয়ে পড়ো। আল্লাহ্ একটি ব্যবস্থা করবেন। অন্য কাজ খোঁজ বাদল।

তাই দেখমু।

মাথার কাপড় টেনে পা বাড়াল মরিয়ম। বৌয়ের কাছে অনুনয় করে বাদল বলছে, আর মারমুনা তোরে। আমারে মাপ কইরা দে।

একটু আদর পেয়ে কান্নার শব্দ যেন বেড়ে গেলে বৌয়ের। বুকের ভেতর তিক্ততায় ভরে উঠলো মরিয়মের। এতো সুন্দর সকাল, যেন বিষাদে ভরা। এই সকাল নিয়ে কত কবি সুন্দর সব বর্ণনায় কবিতা করেছে। তাদের হয়তো এই ঘুণ্টিঘরে থাকতে হয়নি কখনো। তাহলে স্বপ্ন মাখা কবিতা না লিখে বিদ্রোহ ভরা কবিতা লিখতো তারা।

মালিকগুলো তিন চার মাস ধরে বেতন দেয় না শ্রমিকদের। কত টাকা

www.banglainternet.com

যে ওদের দরকার আল্লাহ্ জানেন। শ্রমিকের রক্ত আর মাংস না খেলে হয়তো পেট ভরে না ওদের।

প্রাতকর্ম সেরে অজু করে জায়নমাজে বসলেন মরিয়ম বেগম। নামাজ পড়ে, এক মনে আল্লাহ, রাসূলের নাম করেন তিনি। তারপর বসলেন কুরআন খুলে।

একটু পরেই পড়তে এলো ছেলেমেয়েরা। দিন-দিন ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়ছে তার। অনেকেই জেনে গেছে ব্যাপারটা। মাসে মাত্র একশ' টাকা। যার আয় কম তার জন্য পঞ্চাশ। কুরআন বন্ধ করে রেখে ওদের পড়াতে মনোনিবেশ করলেন মরিয়ম বেগম।

সকালের সূর্যটা যেন নতুন হয়ে ধরা দিয়েছে তার জীবনে। কেন যেন নতুন লাগছে আর মনে হচ্ছে কেমন বন্ধন ছাড়া। সিকান্দার চলে গেছে, তাই হয়তো। দূর থেকে রাশি-রাশি সোনালি আলোরশ্মি দীর্ঘ রশির মতো ছড়িয়ে পড়েছে প্রকৃতির মাঝে। এ যেন নতুন যাত্রা। আজ যেন সাদা শাড়ি পরতে ইচ্ছে করছে মরিয়ম বেগমের।

কচি-কচি মুখের উচ্চস্বরে শুদ্ধ উচ্চারণ, আলিফ বে তে ছে জিম হা... সুরাগুলো মুখস্ত পাঠের মধুর পূর্ণ-পরিব্যপ্তি পুরো ঘরজুড়ে। ঘুম ভেঙে গেল রুদ্রর। চোখ বন্ধ করে থেকে বুঝতে চেষ্টা করছে সব।

মায়ের বিছানায় শুয়ে আছে সে। মন্থরিত মনে পড়তে লাগলো রাতের সব কথা। একটি শূন্যতা আর অবসাদ গ্রাস করছে তাকে। তিক্ত হয়ে উঠলো মন। অপরাধে যেন নুয়ে পড়ছে শরীর। না আর খাবে না সে।

আঁড়চোখে দেখতে লাগলো মায়ের মুখখানি। এতো পবিত্র আর প্রসন্ন মুখ জীবনে আর কখনোই দেখেনি সে। কত কষ্ট করছে মা। ভাতের জন্য হয়তো ছেলেমেয়েদের পড়াতে শুরু করেছেন মা। তাহলে সে বসে কেন? ছি ছি নিজেকে যেন ধিক্কার দিতে ইচ্ছে করছে আজ। আজই মাপ চেয়ে নিতে হবে মায়ের কাছে। কপালের দাগটি যেন অলঙ্কার হয়ে আছে মায়ের কপালে। বাবার দেয়া আঘাতের দাগ।

নিজেকে খুবই অপরাধী লাগছে রুদ্রর। কলতলা থেকে কানে ভেসে আসে চিৎকার-চেচামেচি, তার সাথে অনর্গল অকথ্য গালাগালি। খিস্তি ছাড়া যেন একটি কথাও বলতে পারে না কেউ।

দ্রুত উঠে কলতলায় চলে গেল রুদ্র। ধমকাতে লাগলো সবাইকে। কেউ গালাগালি করবি না। একটি গালাগালও যেন না শুনি। চুপ...

মুহূর্তেই চুপ হলো সবাই। মায়ের কানে ভেসে এলো রুদ্রর কণ্ঠ।

বকাবকি করতে বারণ করছে রুদ্র। তার ভাষাতেও যে এটি পরির্বতন এসেছে। খুবই বিস্মিত হলেন মা।

কিন্তু বেশিক্ষণ ধরে থাকলো না সেই বিস্ময়ের সময়। কিছু হয়তো ঢাকার চেষ্টা করছে সে। গত রাতে মদ খেয়ে এসেছিল সেটা ঢাকার জন্যই হয়তো এই ভদ্র পথ অবলম্বন করেছে। নিজের মনে হেসে উঠলেন মা। করুণ আর তিক্ত। আবার মন দিলেন ছেলেমেয়েদের পড়াতে।

পড়া শেষে চলে গেল ছেলেমেয়েরা। আজ যেন কোনো অস্থিরতা নেই মরিয়মের মনে। তেমন কোনো তাড়া নেই কোনো কাজে। কেউ এসে চুলের মুঠি ধরে বলবে না, মাগী ভাত দে। মাটিতে ফেলে কোঁকে লাথি কষবে না কেউ। কোথায় মনটা অনন্দে মেতে উঠবে, তা নয়। হারানোর যন্ত্রণায় কেন যেন ডুবে আছে মন। ব্যথায় যেন কুকিয়ে উঠলো মরিয়ম।

শ্লথ পায়ে রুদ্র এসে দাঁড়ায় মায়ের সামনে। মুখে অপরাধের ছাপ। তবে চোখে যেন সকরুণ নিবেদন। ছেলেকে কখনো এমনটা দেখেনি মা। বুকের ভেতরটা নড়েচড়ে উঠলো! রুদ্র বলল, মা! বাবাকে দেখছি না?

একেবারেই ভদ্রলোকদের মতো কথা। উত্তর দেয় না মা। চোখে জল আসে। নিজেকে সংবরণ করে আঁচলে মুখ ঢাকে। উৎকণ্ঠিত হয়ে ওঠে রুদ্র। কি হলো মা, তুমি কাঁদছ কেন?

রুদ্ধ কণ্ঠে মা বলেন, অদৃষ্টে কান্না থাকলে হাসি পাবো কোথায়?

কি হয়েছে বলবে তো। হাঁটু গেড়ে মায়ের সম্মুখে বসে রুদ্র।

যা সত্য তা বলতেই হলো। এ তো আর চেপে রাখা যাবে না। ধীরে-ধীরে সব বলতে লাগলেন মা। রুদ্র শুনছে। ওর মুখ স্থির আর কঠিন। ভ্রু কুঞ্চিত আর অনুভূতি জাগানো দৃষ্টি।

প্রথমে মায়ের পা তারপর মাকে জাড়িয়ে ধরলো রুদ্র। কাঁদলো না। কিন্তু মাকে জাড়িয়ে ধরার জন্য বুকের ভেতরটা হু-হু করে উঠলো। কোনোদিন মাকে জড়িয়ে ধরা হয়নি এভাবে। হয়তো সেই ছোট বেলায়। যখন জ্ঞান ছিল না। মাকে জড়িয়ে বুকের সাথে লাগিয়ে রাখলো রুদ্র। কাঁন্নার ঢেউয়ে কেঁপে-কেঁপে উঠছে মায়ের বুক, তার সাথে সমস্ত শরীর। রুদ্রর মনে হলো, ভালোই হয়েছে। লোকটি কি দিয়েছে মাকে? অভুক্ত অবস্থাতেই বেশি কেটেছে তার। তার উপর কি মারটাই না মেরেছে। লোকটার সাথে মায়ের শারীরিক বন্ধনও হয়তো ছিল না। লোকটি ছিল দুশ্চরিত্রের। মা ঘৃণা করেন তাকে। মায়ের কাপালে চুমু খেয়ে রুদ্র বলে, তুমি কাঁদছ কেনো মা। আমি আছি। কোনো চিন্তা করো না।

www.banglainternet.com

ছেলের সে কথায় মনের ভেতর ভরসা পেয়েছিল মরিয়ম। কিন্তু ছেলে তার এমন করে বদলে যাবে তা ভাবতে পারেনি কখনো। আজকাল রাত করে বাসায় ফেরে না রুদ্র। মুখে অশ্রাব্য শব্দ নেই একেবারেই। কারো সাথে লাগতে যায় না। কালা, বিলু, বুলেট ওদের সাথে মিশে না। মদ যে খাচ্ছে না সে ব্যাপারটা বোঝাই যায়, গাঁজা হয়তো ছেড়ে দিয়েছে। মায়ের সাথে কাজে সাহায্য করছে। বিকেলে বের হয়ে গেন্ডারিয়ার দিকে যায়। দু'টি টিউশনি ধরেছে। বেশ টাকা পাওয়া যাবে। অনেক বড় লোকের ছেলেমেয়ে।

এভাবে চলতে থাকে রুদ্র। মায়ের যেন বিশ্বাস হয় না। যেন অসহ্য হয়ে ওঠে সব। এতো শীঘ্রই এতোটা পরিবর্তন যেন চোখে পড়ার মতো। শুধু মায়েরই নয়, ঘুণ্টিঘরের কারো চোখ এড়ায়নি। লোকে বলে, মা-ছেলেকে ফেলে বাবাটা এভাবে চলে গেল। তার পর থেকেই রুদ্র যেন কেমন হয়ে গেছে। আজকাল কালা প্রায় আসে। বলে, গুরু তোমারে ছাড়া কাম চলবো না।

বিলু বলে, আব্বে রুদ্দ, ভদ্দ হইয়া গেলি নিহি বে।

রুদ্র হাসে। বলে, আমি বুঝি অভদ্র।

আব্বে দেখছো নিহি কেমন ভদ্র কতা কয়?

কালা বলে, ঠিকই করছে। ভদ্দ কতাও দরকার আছে বিলু। নইলে দাম নাই। হারা জীবন ঠ্যাছরা হইয়া দু-চার ট্যাকাই কামাইতে হইবো। দেখলি না, নেতার কামে না গেলেই পুলিশের ভয় দেহায়। ট্যাকা থাকলে আর পারবো না। কি বলো গুরু।

হাসে রুদ্র। ঠিক বলেছিস।

কথা না বাড়িয়ে ওদের কাছ থেকে কেটে পড়ে রুদ্র। এখনো ওদের বোঝাবার সময় আসেনি। নিজেকে আর একটু শক্ত করে ওদের বোঝাতে হবে। এই বস্তির লোকগুলোকে ঠিক করতে হবে। এভাবে আর কতদিন! ঊর্ধ্বশ্বাসে চলে মানুষ। কারো যেমন খাবার ঠিক নেই, তেমনি মরে যাবার পর দাফনেরও ঠিক থাকে না। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে যাচ্ছে কিন্তু ভাগ্যে কোনো উন্নতি নেই। কেন নেই?

একটু বড় হলেই সবাই মাস্তান হাবার পথ ধরছে। মদ খেয়ে ঘুণ্টিঘরের মোড়ে দাঁড়িয়ে খিস্তি করে জানান দিচ্ছে তার মাস্তানী। কেউ কিছুই বলছে না। কেউ যেমন প্রতিবাদ করছে না, আবার বোঝাতে আসছে না কেউ। শুধু ওদের ব্যবহার করার জন্য ব্যস্ত সবাই। মনে হয় সরকারি দলের নেতাদের কেনা গোলাম। কথা না শুনলেই জেলে পুরে শাসন করে আবার ছাড়িয়ে নিয়ে

আসে। সেবার কি মারটাই খেল কালা। তার মধ্যেই কোনো রকমে বেঁচে থাকতে হয় কালাদের। মোস্তফা মল্লিকের কাছে গিয়ে বেশ কামাচ্ছে কালা। একটি টেন্ডারের বাক্স পুড়িয়ে ফেলেছে সেদিন। বড় কাজ। কোটি-কোটি টাকার। অফিসের বড় সাহেবদের সাথে হাতে করে ঐ কাজটি হাতিয়ে নিয়েছে মোস্তফা মল্লিক। কালা, বিলু ওরাও বেশ টাকা পেয়েছে। পালিয়ে থাকতে হয়েছে বেশ কয়েক দিন। এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। রুদ্রকে দিতে চেয়েছিল সেই টাকার ভাগ। কিন্তু আনেনি রুদ্র। বলেছে, আমি তো কাজ করিনি। যখন করবো তখন দেখা যাবে।

আসলে আর কোনোদিনই হয়তো রুদ্র যাবে না ওদের সাথে। বাড়িতে বইয়ের তাক। বিভিন্ন রকম বই নিয়ে এসেছে রুদ্র। রাত-দিন সেগুলো পড়ে। মাঝে-মাঝে দু-চারজন বন্ধু আসে ঘরে। যাদের দেখলেই বোঝায় খুব সভ্য এবং ভালো মানুষ। মেয়েরাও আসে। মায়ের সাথে আলাপ পরিচয় হয়েছে তাদের। রুদ্রর চেয়ে বয়সে বড় অনেক লোকও আসে। তারা কিসব কথা বলে। বড় শক্ত-শক্ত কথা। দেশ নিয়ে, রাষ্ট্র নিয়ে আর ধনী গরিব নিয়ে। মায়ের মনটা যেন কেমন করে ওঠে। আবার কোনো ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ছে না তো রুদ্র।

কিন্তু মনটা আবার শান্ত করে। ওরা ভালো কাজের কথাই বলছে। যদি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে তাহলে ভালো কাজের জন্য পড়বে। এতে ভয়ের কি আছে। পা ছড়িয়ে মেঝেতেই বসে এই দামি মানুষগুলো। এর মধ্যে অনেকেই খুব বড় ঘরের। রুদ্রর চেয়ে গরিব আর একজনও নেই। লাল চায়ের সাথে ওদের মুড়ি খেতে দেন মা। ওরা মাকে মা বলেই সম্বোধন করেন। প্রশংসা করে রুদ্রর। তার সাথে বলে এই বস্তিটা ছাড়তে হবে। না হলে বিপদে পড়তে হবে।

রুদ্র ক্ষেপে যায়। না এটাই আমার জন্মস্থান। এখানে থেকেই আমি এখানকার লোকগুলোকে মানুষ করে গড়ে তুলবো। ওদের জন্য তার খুব কষ্ট। মানুষগুলোর দিকে তাকানো যায় না। না খেয়ে থেকে যেন বিকলাঙ্ক হয়ে যাবার পথে। ওদের পেটে রাজ্যের সব ক্ষুধা জমে থাকে দিন-রাত। কেউ ওদের ভাত দেয় না। ভাত চাইতে গেলে লাথি মারে। ওদের অপরাধটা কোথায়? জন্ম হয়েছে সেটা? জন্ম তো বিধাতার ইশারা ছাড়া হয়নি। তাহলে অদৃষ্টের দোহাই দিয়ে লাভ কি। এদেশের মানুষে ভাগ্য হাতের মুঠে নিয়ে যারা ভগবান হয়ে বসে আছে তাদেরকে টেনে কেনো রাস্তায় নামানো যাবে না।

www.banglainternet.com

ভুরি ভুরি বই এনে পড়তে থাকে রুদ্র। তার সাথে মাও পড়ে। মাঝে-মাঝে লজ্জিত মুখে বলে, এই বুড়ো বয়সে পড়ছি, লোকে দেখলে লজ্জা দেবে।

রুদ্র হাসে। কি যে বলো না মা। তুমি এখন তো মাস্টার। তোমার তো সব জানা উচিৎ। না হলে ছাত্রদের পড়াবে কি করে।

ছেলের দিকে তাকিয়ে বুকটা জুড়িয়ে যায় মায়ের। নিশ্চই খুব ভালো রেজাল্ট হবে রুদ্রর। ওর মাথা খুব ভালো। যদি এতোটা সময় নষ্ট না হতো তাহলে হয়তো বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান হতো রুদ্র। তবুও আল্লাহ্ যে এতোদিনে মুখ তুলে তাকিয়েছে তাতেই হাজার শুকর। ছেলেকে চা বানিয়ে দেন মা। দু'জন মিলে এক সাথে গল্পে বসে। মানুষের গল্প। জীবনের গল্প। সাম্যের গল্প। পবিত্রতার গল্প। ধর্মের গল্প। বাঙালি জাতির ইতিহাসের গল্প।

৪

ঘরের ভেতরটায় সাদা আলোয় পরিপূর্ণ। মেঝেতে দামি কার্পেট, দেয়ালে সাঁটা হরিণের চামড়া, অন্য পাশে বিখ্যাত চিত্রকরের দামী পেন্টিং। ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়ে মেঝে থেকে প্রায় ছাদ অবধি দেয়ালের সাথে লাগানো একটি কাঠের বুকসেল্ফ। বিভিন্ন রকম দেশি-বিদেশে লেখকের বই দিয়ে ঠাসা। বসার জন্য শুধুমাত্র তিনটি চেয়ার, সামনে টি টেবিল। তবে খুবই দামি। এক পাশে ছোট একটি ট্রলির মতো। সেটার উপরে একটি ডিভিডি প্লেয়ার। নিচে রেকর্ড হেঙ্গারে নজরুল, রবীন্দ্রনাথ, অতুল প্রসাদের গানের কয়েকটি রেকর্ড। তার উপরে ছড়ানো ছিটানো কৃত্রিম সবুজ লতা-পাতা। কিন্তু অগোছালো নয়।

দরজার ঠিক উপরে দেয়ালের সাদা অংশে লেখা সুকান্তর, 'আঠারো বছর বয়স' কবিতার কয়েকিট লাইন–

আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ,
স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি,
আঠারো বছর বয়সেই অহরহ
বিরাট দুঃসাহসেরা দেয় যে উঁকি।

গোটাগোটা অক্ষরে লেখা লাইনগুলো। নিশ্চয়ই ইরা লিখেছে। এ ঘরে বসে পড়ালেখা করে সে। ওর শোবার ঘর ভিন্ন। বন্ধুদের আড্ডাও হয় এঘরে। এবাড়ির প্রতিটি ঘরই খুব সাজানো গোছানো আর দামি সব আসবাবপত্রে ঘেরা। পাথরের মূর্তি হতে শুরু করে হরিণের চামড়া পর্যন্ত। এই বিশাল বাড়িতে মাত্র তিনটি প্রাণী বাস করে এখন। ইরার ভাই রায়হান পড়তে চলে গেছে কানাডা। বাবা বড় নেতা। বিএনপি'র আমলে মিনিস্টার ছিলেন। তখন বাড়িতে পুলিশ গার্ড থাকতো দিন-রাত। এখন পার্টি অপজিশনে। তাই

www.banglainternet.com

মন্ত্রীত্বের সাথে-সাথে এ বাড়ির জৌলুসও হারিয়েছে কিছুটা।

তবে অভিজাতন্ত্রের ছাপ এখনো পুরোপুরি বিদ্যমান। আজ বাসায় নেই ইরার বাবা। পার্টির কাজে ঢাকার বাইরে গেছেন তিনি। ফিরতে হয়তো মধ্য রাত হবে। আর মা রেবিয়ে গেছে সেই দুপুরে। শেষ রাতের আগে ফিরবেন না। শেষ রাতে ফিরে ঘুমাবেন দুপুর অবধি। তার পর লাঞ্চ করে বেরিয়ে যাবেন। এটা এক রকম নিত্যকর্মে পরিণত হয়েছে তার। তার সকল ব্যস্ততা ক্লাব নিয়ে।

আজও হয়তো পার্টি আছে। গতকাল নাটক দেখতে গিয়েছিলেন মহিলা সমিতির মঞ্চে। নাটক দেখে এসে বন্ধুদের সাথে শুরু হয় ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা। কখনো টেলিফোনে আবার কখনো বাসায় ডেকে এনে। আর শেক্সপিয়ার হলে তো কথাই নেই। এক সপ্তাহ আগেই টিকিট কিনে বসে থাকবে।

নাটকের বিভিন্ন চরিত্র নিয়ে যত আলাপ। এই চত্রির ভালো হয়নি, ঐ চরিত্রটা খুবই ভালো হয়েছে, আর একটু ওভাবে করলে ভালো হতো...। কিন্তু বাংলা নাটকের ব্যাপারে ওনাদের দারুণ বিরাগ। বাংলা চ্যানেলগুলোতে এই সব মিডেল ক্লাস সস্তা আবেগ দেখিয়ে ছেলে মেয়েগুলোকে নষ্ট করছে। কেন যে এগুলো দেখায়।

কিন্তু হিন্দি সিরিয়ালের মধ্যে তাদের গভীর অনুরাগ। মনোযোগ দিয়ে দেখে এবং আলোচনা চলে। ইস! আজ গনেশকে মেরে ফেলেছে কার্তিক। মন্দিরা খুব খারাপ, কার্তিকের সাথে প্রেমের অভিনয় করছে। প্রেমা খুব ভালো। মন দিয়ে ভালোবাসে যাদবকে। অমল পরকীয়া প্রেম করে যাচ্ছে একটির পর একটি। মেয়েদের শরীরই ওর কাছে সব। নারীর শরীর দেখলে ওর চোখের তারা কাঁপে, তাকে বিছানায় পাবার জন্য। রতন ছেলেটি খুব লম্পট। ইন্দুর কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবে। ইন্দুর ফিগারটা কিন্তু দেখার মতো। ইন্ডিয়ান মেয়েরা নিজেকে ধরে রাখতে জানে...।

এসব শুনে ক'দিন সিরিয়াল দেখেছে ইরা। কিছুই পায়নি সেখানে। শুধু মুখরোচক কিছু নষ্ট গল্প, আর পরকীয়া প্রেমের হাজারো কাহিনী। আসলে নির্বোধ মানুষগুলো মনে করে অন্যের সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা করলেই বুঝি স্মর্ট হওয়া যায়। হোক সে কু-সংস্কৃতি। আসলে আমাদের দেশের কিছু মানুষ আছে যারা প্রকৃত নির্বোধ। তারা দেশ, দেশের ভাষা, সংস্কৃতিকে তাচ্ছিল্য করে ওয়েস্টার্ন সভ্যতার খুব কদর করে নিজেরা জাতে উঠতে চায়। অসলে তারা জানে না নিজের দেশকে শুধু অনার্য অসভ্যরাই তাচ্ছিল্যের চোখে দেখে।

প্রধান ফটক পার হয়ে ভেতরে ঢুকলো রুদ্র। দারোয়ান উঠে দাঁড়ালো। হেসে বসতে বলল রুদ্র। গৃহপরিচালক দুলাল এলো। আপামনি আপনাকে বসতে বলেছে?

ইরার পড়ার ঘরে গিয়ে বসলো রুদ্র। এখনো আসেনি কেউ। দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে চলেছে। দিন-রাতের পার্থক্য একেবারেই বোঝা যাবে না এঘরে। সব সময়ই কৃত্রিম আলো জ্বালানো থাকে।

দাঁড়িয়ে খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে বইগুলো দেখছে রুদ্র। গোর্কির আমার ছেলে বেলা নিয়ে চোখ বোলাতেই এলো ইরা।

কেমন আছেন? বলল ইরা।

আপনি কি ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলের নাম শুনেছেন? রুদ্রর দৃষ্টি বইয়ের পাতায় আর মুখের ভাব স্থির।

এটা কি আমার প্রশ্নের উত্তর হলো? ভ্রুকুটি আর ঠোঁটে হাসি ইরার।

ফ্লোরেন্স নাইটিংগেল হবার শখ হলো কেন?

বুঝলাম না?

না বোঝার মতো কিছুই তো বলি নি আমি।

কিন্তু উত্তর খুঁজে পাচ্ছি না।

আর একটু সহজ করে বলছি। ১৮২০ সালে নাইটিংগেলের জন্ম। সেই সময় তিনি ছিলেন শিক্ষিতা একজন নারী। পড়ালেখা শেষ করে তিনি যখন তার বাবা মাকে জানালেন সেবিকা হতে চান তিনি। তখন কিন্তু তার বাবা-মা বিস্মিত হয়েছিলন। এতো সব পেশা রেখে কেনো সেবিকা হবে ফ্লোরেন্স।

তার সাথে আমার মিল কিসে, কাজে না কি চেহারায়?

আছে। আগে বলেন আপনি কি তার সম্পর্কে জানেন?

জানি। আলেকজান্দ্রিয়াতে এক হাসপাতালে তার প্রথম কাজ। তার পর যুদ্ধক্ষেত্রে আহত হওয়া সেনাদের নিয়ে। কিন্তু তার সাথে আমার মিল কোথায়?

সে নতুন কিছু করে দেখিয়েছে। আর আপনি করতে চাচ্ছেন?

দৃষ্টি প্রশস্ত করে তাকলো ইরা।

একজন মানুষ সেই সময় ভেবেছিল শুধুমাত্র ওষুধ দিয়ে রোগী সুস্থ হয় না। তার জন্য দরকার সেবা।

তার ভাবনা সঠিক ছিল।

আর এই যুগে আপনার ভাবনাটা?

দেখুন, সভ্যতার পথে এগিয়ে যেতে কেউ-কেউ এগিয়ে আসবেই।

www.banglainternet.com

জীবন আর রক্ত এই পথে অনিবার্য।

আপনি ঠিক বলেছেন। কিন্তু আপনি বেড়ে উঠেছেন এবং এখনো আছেন পুঁজিতন্ত্রে বিশ্বাসী এবং লালন করা একটি পরিবারে।

একটু ভাবে ইরা। তারপর বলে, আমার বাবা ক্যাপিটালিস্ট বলেই হয়তো আমার এই পথে আসা।

কারণ?

গণতন্ত্রের আড়ালে পুঁজিতন্ত্রের কুফল আমি যতটা দেখতে পারি, হতদরিদ্র একজন লোকের পক্ষে ততটা জানা সম্ভব নয়।

কিন্তু এই পথে কি পাবেন আপনি?

পাচ্ছি তো।

কি?

ভালো কিছু মানুষের সাথে মেশার সুযোগ আর মানুষের জন্য কিছু করার আত্মবিশ্বাস। এ পথেই সময়গুলোকে ব্যয় করা। এর চেয়ে বেশি কি বা পাবার থাকে মানুষের।

কথা থেমে যায়। ইরার দিকে তাকায় রুদ্র। নিরাভরণ সাজ। গায়ে সাধারণ পোশাক। তবুও যেন রাজকুমারীর মতো দেখতে। চোখে মায়া আর পবিত্রতা। মুখে অকুণ্ঠিত উজ্জ্বল হাসি আর জয় করার আনন্দ। দেখতে এতো নরম, কিন্তু দৃঢ় আর দক্ষ অন্তর। যেন সুন্দর কাজের জন্য হারাতে নেই। সম্মুখে বিশ্বাসী আলো।

আকাশে মেঘ জমছে। ঈষাণ কোণে কালো জমাট মেঘগুলো ছোটাছুটি করছে, অস্থির আর ভয়াল গর্জন তুলে। হয়তো বৃষ্টি ঝরবে। অশনির সঙ্কেতে থমথমে চারিদিক। সেই মেঘের মধ্যে এক-এক করে এসে হাজির হলো সবাই। কারো পোশাকে ধুলো, আলুথালু অগোছালো চুল, বিবর্ণ মুখ, তবুও যেন নির্মল একটি হাসি লেগে থাকে ঠোঁটের ভাঁজে।

ঋতু, মিরা, কল্লোল, জয়ীতা, দিপন, রানা, কাজল, আলম, ফারুক, আদিত্য ভাই আর ডাক্তার হুমায়ুন কবীর চলে এসেছে এরই মধ্যে। ডাক্তার বললেন, প্রফেসর সাহেব কি এখনো আসেন নি?

রুদ্র বলল, স্যার তো এখনো আসেন নি। মেঘ বৃষ্টিতে আটকা পড়লো কি না...।

নিচে কার্পেটের উপর বসে পড়লো সবাই। হাতের বইটি রেখে নজরুলের মানুষ কবিতাটি পড়ে শোনাতে লাগলো রুদ্র। মুহূর্তেই যেন ঝিম ধরে গেছে পুরো ঘরটি। সবাই শুনছে মন দিয়ে। এ যেন জীবনের কথা,

মানুষে কথা। কেউ-কেউ যেন বিদ্রোহে ফেটে পড়বে এখনি, কেউ আবার শান্ত চোখে অদৃশ্যে তাকিয়ে কবিতার পটভূমিকায়। জয় করতেই হবে।

ভেতরে ঢুকলেন রেজাউল করিম সাহেব। তার মাথায় দু-চার ফোটা বৃষ্টির দাগ। মলিন মুখ আর উদাস দৃষ্টি। দীর্ঘ দিন ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যলয়ের অধ্যাপনা করে আসছেন তিনি। এই দীর্ঘ পথ ছাত্র পড়িয়ে যেন হাঁপিয়ে উঠেছেন তিনি। মাঝে-মাঝেই বলেন, কি হলো এতো ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে। এতো নীতিকথা আর সাম্য, সত্য, ধর্মের কথা বলে। এই ছেলে মেয়েগুলো যদি কথা শুনতো তাহলে তো দেশের চেহারাটা বদলে যেতে পারতো এতো দিনে।

রুদ্র বলল, আপনাকে খুবই আহত দেখাচ্ছে স্যার।

ঈষৎ হাসার চেষ্টা করলেন স্যার। রুদ্র বলল, কি হয়েছে। মন খরাপ?

স্যার বললেন, এদেশে কত জন মানুষের মন ভালো থাকে বলতে পারো রুদ্র?

সে কথা সত্যি। যদিও মন ভালো-মন্দ মাপার কোনো যন্ত্র আবিষ্কার হয়নি এখনো। তবুও মানুষের উর্ধ্বশ্বাস আর মলিন মুখ দেখলেই বোঝা যায় কি ভাবে দিন কাটাচ্ছে তারা?

আদিত্য ভাই বললেন, অনেক দুঃখ নিয়েও এদশের মানুষ হাসতে জানে। না হলে হাসি যেন নির্বাসিত হতো চিরকালের জন্য।

স্যার বললেন, ঠিকই বলেছ আদিত্য। তার পর বললেন, আজকের যুগান্তরটি দেখেছ তোমরা?

রুদ্র বলল, না স্যার।

ইরা বলল, দেখেছি। কেনো?

একটু থেমে হাঁপানি রোগীদের মতো দীর্ঘ একটি নিঃশ্বাস নিয়ে স্যার বললেন, একটি খবর ছাপা হয়েছে সেখানে। সময়টা বড় ক্লান্ত আর কষ্ট দিয়ে গাঁথা। তাই হয়তো আমরা আজ দাঁড়িয়েছি একটি রেখায়। বয়স আর কাজের ভেদাভেদ ভুলে। মানুষের অন্তরের ক্ষোভ যেন ভস্মীভূত সভ্যতার লাভা।

তার পর একটু থেমে বললেন, একজন মা ক্ষুধার জন্য তার গর্ভের সন্তান কে মাত্র দশ হাজার টাকায় বিক্রি করার জন্য ঘুরছে দ্বারে-দ্বারে।

খবরটাতে যেন শিউরে উঠলো সবাই। চোখে আগুন ঝরতে লগালো রুদ্রর। তার মায়ের মুখটা মনে পড়ছে তার। কত কষ্ট করে মা তাকে বড় করেছে। রুদ্রর কণ্ঠে যেন উত্তাপ। বলল, একটি দেশে সরকার যখন মানুষের ন্যূনতম চাহিদা পূরণে পরিপূর্ণ ব্যর্থ হয়ে পড়ে তখন মায়েদের আর কি বা

www.banglainternet.com

করার আছে। মানুষ যা খেয়ে জীবন ধারণ করবে, সেই চালের বাজারে আগুন। সরকার যেন অবুঝ শিশু। তাদের কিছুই করার নেই। অথচ ক্ষমতার ব্যাপারে খুব সজাগ। এভাবে একটি দেশ চলতে পারে না। বিপ্লব দরকার।

ইরা বলল, আপনি খুব উত্তেজিত হয়ে পড়ছেন। এভাবে কোনো কিছুরই সমাধান হতে পারে না। সরকারগুলো তাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে বারবার, সে জন্য আমাদের গঠনমূলক কাজ করা দারকার।

রুদ্র বলল, ব্যর্থ হচ্ছে না। ইচ্ছে করেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করছে না।

আদিত্য বলল, এ সবের জন্য নিশ্চই দল বা দেশের প্রধানরাই দায়ী।

আপনার এই কথার সাথে দ্বিমত রয়েছে আমার। বলল মিরা।

ওদের মধ্যে বিভিন্ন রকম তর্ক শুরু হলো। দেশের প্রধান যদি নিজের সম্পদ এবং কাজের হিসেব নিয়ে জনগণের কাছে স্বচ্ছ হতে না পারে, তবে অন্য সবাই নিশ্চই সোজা হয়ে চলবে না। রাষ্ট্র হচ্ছে পরিবারের অনুরূপ। এখানে পরিবার প্রধান যদি সৎ হয় তাহলে পরিবারের অন্য সদস্যদের সৎ হতে হবে, না হলে পরিবার ত্যাগ করতে হবে। তার সাথে ঐ পরিবারে অধীনস্থ যত লোক থাকবে তাদেরও সঠিক পথে চলতে হবে। একটি রাষ্ট্র বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত। এরা প্রজাতন্ত্রের চাকর।

প্রজা শব্দটায় অনেকেই দ্বিমত করলো। প্রজা শব্দটাই বাদ দেয়া উচিৎ। কিসের প্রজাতন্ত্র। সোজাসুজি গণতন্ত্র আর জনগণ। প্রজাতন্ত্র আর প্রজা! শাসকশ্রেণী সাধারণ মানুষকে জনগণ মনে না করে মনে করছে প্রজা। আর সাধারণ মানুষেরও মাইন্ড সেটআপ সেভাবেই হচ্ছে। না হলে আওয়ামী লীগ আর বিএনপির মধ্যে কোনো গণতন্ত্র নেই। তারা বংশপরম্পরায় তাদের দুই পরিবারের অযোগ্য নেতৃত্বের কাছে কোটি-কোটি মানুষকে জিম্মি করে রেখেছে। মাত্র দু'টি মার্কায় দুলছে মানুষে ভাগ্য।

রুদ্র বলল, এটা তো আমাদেরই দোষ। আমাদের মধ্যে এখনো সেই ধ্যান-ধারণা। হয় নৌকায় নয়তো ধানে। জণগণের এই সব মনোভাব যতদিন না বদলাবে ততদিন কিছু করা সম্ভব নয়। পলিটিক্যাল পার্টি দু'টি খুব ভালোভাবেই রিট করতে পারছে মানুষের মনের অবস্থা। তাই তারা নিজের মতো করেই দেশ নিয়ে খেলছে। তবে আমরা যদি গণমানুষের মধ্যে বোধ জাগরণের কাজ করতে পারি তাহলে অনেক কিছু সম্ভব।

ওর চোখে জয় করার প্রবণতা। কেউ যেন কথা বলছে না রুদ্রর কথার মাঝে। সবাই শুনছে। কথাগুলো যুক্তি আর বাস্তবতায় ঢাকা।

আদিত্য বলল, পুরো জাতি যেন বিভক্ত হয়ে আছে দু'টি মেরুতে। যেন

দু'জন পাকা শিকারি। আফিম খাইয়ে বোবা আর অন্ধ করে নেশার স্বপ্ন জাগিয়ে রেখেছে সবার মনে। যেখানেই যাবে, দিনমজুর হতে শুরু করে জেনারেল পর্যন্ত সবাই যেন দু'টি মেরুতে আবদ্ধ। তাদের যেন অন্য কোথায়ও যাবার জায়গা নেই। এরা রাষ্ট্রযন্ত্রকে এমনভাবে ব্যবহার এবং বিকল করে রেখেছে, যেখানে সাধারণ মানুষ কোনো মানুষ নয়। এদের কোনো অধিকার নেই, রাষ্ট্র থেকে কোনো সুবিধার কথা ভাবাও যেন পাপ।

ইরা বলল, রাজনৈতিক নেতাদের দুর্নীতি আর ব্যর্থতার পুরোপুরি সুযোগ নিচ্ছে অসৎ ব্যবসায়ী আর দুর্নীতিগ্রস্ত চাকরিজীবী। দলের ক্ষমতা বদল হলে কিছুটা হলেও বিপদে পড়তে হয় দলের নেতাদের। এটা প্রতিহিংসাবশত হোক বা সঠিক বিচারের কারণেই হোক। কিন্তু ধরাছোঁয়ার বাইরে রয়ে যাচ্ছে প্রজাতন্ত্রের অসৎ কর্মকর্তা এবং কর্মচারীরা। একটু লক্ষ্য করলেই দেখবেন, কিভাবে দেশটাকে লুট করছে তারা। আওয়ামী লীগ এবং বিএনপিকে অবশ্যই সাপোট করছি না আমরা। কিন্তু এই দু'টি দলের নেতাদের সাথে সম্পর্ক রেখে দেশটাকে অন্ধকারে ডুবিয়ে দিচ্ছে প্রজাতন্ত্রের আমলারা। অথচ নির্বোধের মতো তা দেখে যাচ্ছে দেশের নেতারা। তাদের একটু লোভের জন্য ঘুষ আর সুদের মন্ত্রে ছিবড়া হয়ে যাচ্ছে দেশটা, সে খেয়াল বা বোধ তাদের নেই।

রুদ্র বলল, এদেশে গণতন্ত্র নেই। যদি থাকতো তাহলে সাধারণ মানুষ এভাবে বঞ্চিত হতো না। এদেশটা চালাচ্ছে ক্যাপিটালিস্টরা। একটু লক্ষ্য করুন। চোখ দুটি জ্বলজ্বল করে উঠলো রুদ্রর। মাঝে-মাঝে দৈনিকগুলোতে দেখা যায়, বড়-বড় ব্যবসায়ীরা মন্ত্রীকেও পরোয়া করছে না। তার কারণ কি? একজন মন্ত্রীর কথা যখন কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান শুনবে না, বা তাদের অবজ্ঞা করে, তখন ভাবতে হবে মন্ত্রিসভা আর দল বিরাট সঙ্কটে রয়েছে। সঙ্কট প্রধানত দুই রকম। প্রথমত, দলে প্রধান বা প্রধানমন্ত্রী তার হাতে সকল ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখতে চায়। এই কারণেই দেশে অনেক ক্ষুদ্র কাজের জন্যও, প্রধানমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করে সবাই। দ্বিতীয়ত, চরম দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রিসভা। বড়-বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণে টাকা নিয়ে নির্বাচন বা অন্য কাজ করে মন্ত্রীরা। তাই ব্যবসায়ীরা যখন ইচ্ছে মতো জনগণের পিঠে চাকুক মারতে থাকে তখন মুখ বুঝে নির্বোধের মতো সহ্য করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না মন্ত্রীদের।

জামাল বলে উঠলো, প্রধানমন্ত্রীকেই যদি সব কাজ করতে হয়, তাহলে এতগুলো মন্ত্রী কি বসে-বসে ঘোড়ার ঘাস কটবে; না কি জনগণের টাকায় নিজের বিলাসিতা করবে?

www.banglainternet.com

স্যার বললেন, তোমার এই প্রশ্নটা যতদিন মানুষের মনে না জাগবে, ততদিন কিছুই করতে পারবো না আমরা।

সেই দায়িত্ব কে নেবে? বলল ডাক্তার।

আমরা সকলেই নেবো। মানুষকে শিক্ষা দিতে হবে। প্রয়োজনে দ্বারে-দ্বারে গিয়ে বোঝাতে হবে। কাউকে না কাউকে তো ত্যাগ করতেই হবে। যেমন করেছিলেন, সক্রেটিস আর রোম গ্রীকের শত-শত দাসেরা।

আদিত্য বলল, সামাজিক আন্দোলনের মুখে অনেক বড় শক্তির পতন ঘটেছে এই পৃথিবীতে। সোভিয়েত ইউনিয়নের জার সরকারের চিরদিনের মতো পতন ঘটেছিল। চীনে মাও সেতুং-এর নেতৃত্বে বিপ্লব সফল হয়েছিল পরিপূর্ণভাবে কৃষি শ্রমিক মেহনতি মানুষের দ্বারা। তাছাড়া গণআন্দোলনের মুখে শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে মাত্র নয় মাসে স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশ। যা কখনোই কেউ কল্পনা করতে পারেনি।

একটু ভেবে স্থিরকণ্ঠে স্যার বলতে লাগলেন, সেই প্রেক্ষাপট আর আজকের প্রেক্ষাপটের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান।

রুদ্র বলল, ঠিক বলেছেন। কিন্তু যুগে-যুগে যুগোপযোগী বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের বিরুদ্ধে দাস বিপ্লব আর কার্ল মার্ক্স, লেনিনের নেতৃত্বে সমাজতন্ত্রের বিপ্লব ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু একটি বিপ্লব হয়েছে। এই যুগেও বিপ্লব দরকার।

আদিত্য বলল, কাদের বিরুদ্ধে?

দৃঢ়তার সাথে রুদ্র বলল, দুর্নীতিবাজ শোষকশ্রেণীর বিরুদ্ধে।

আদিত্য বলল, ভারতের নকশাল আন্দোলনের কথা ভুলে গেলে চলবে না আমাদের। সশস্ত্র বিপ্লব নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়েছিল সেখানে। যে সব সাধারণ মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে জীবনের সব ত্যাগ করে কাজে নেমেছিল বিপ্লবীরা, সেই কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি মানুষই শেষ পর্যন্ত তাদের ডাকাত ভাবতে শুরু করলো। নকশালীরা মানুষকে শান্তি দিতে পারেনি, বরং মানুষের মনে আতঙ্ক ছড়িয়ে দিয়েছে।

রুদ্র বলল, আপনার কথা ঠিক লিডার। কিন্তু আমি সশস্ত্র বিপ্লবের কথা বলছি না। আমি জানি এখন আর সশস্ত্র বিপ্লব সম্ভব নয়। কারণ আমাদের সমাজ ব্যবস্থাটা এমন একটি জায়গায় দাঁড়িয়েছে, না গণতন্ত্র, না সমাজতন্ত্র, না রাজতন্ত্র। তাই এদেশের মানুষ আজ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত আর হতাশাগ্রস্থ। এদেশের কিছু মানুষ প্রতীক পূজা করছে। কিন্তু বেশির ভাগ মানুষই মুক্তি চায়। নির্দিষ্ট একটি প্লাটফর্মের অপেক্ষায় তারা। তাই যে কোনো সময় গণ-

বিপ্লব ঘটতে পারে।

ইরা বলল, এদেশে পঞ্চাশ ভাগ মানুষ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করছে। পেটে ক্ষুধা নিয়ে বিপ্লব সম্ভব নয়?

দৃঢ়কণ্ঠে রুদ্র বলল, ভুল বললেন আপনি। এই পৃথিবীতে যতটা বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে তার সব ঘটেছে বুভুক্ষু মানুষ দ্বারা। বুর্জোয়ারা কেন বিপ্লব করতে যাবে। মেহনতি মানুষগুলো বেঁচে আছে কিভাবে? একে কি বেঁচে থাকা বলে? এর চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এই সত্য কথাটাই তাদের বোঝানো দরকার। প্রতিবাদহীন ধুকেধুকে মরার চেয়ে একদিনে মরে যাওয়া অনেক ভালো। স্বৈরাচার এরশাদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে নূর হোসেন বুকেপিঠে লিখেছিল– স্বৈরাচার নিপাত যাক– গণতন্ত্র মুক্তি পাক। পুলিশের গুলিতে মরতে হয়েছিল তাকে। তবুও যেন বেঁচে গেছে। একদিনই মরেছে। প্রতিদিন মরতে হচ্ছে না। আমরা নিজেরা মরছি আর মৃত্যু পথে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যাচ্ছি আমাদের আগামী মানুষগুলোকে। মানুষকে বোঝাতে হবে...।

কথা বলতে-বলতে কোথায় যেন হারিয়ে যায় রুদ্র। ওর চোখে কখনো ভেসে ওঠে তিক্ততা আবার কখনো গভীর আশার আলো। সকলেই তাকিয়ে থাকে রুদ্রর দিকে। ওর কথা শোনে। রুদ্রর মুখে ভেসে ওঠে বিদ্রোহ আর পবিত্রতা। সে তার মাকে দেখেছে। কি করে নির্যাতন সহ্য করেছে। বস্তির মানুষগুলোকে দেখেছে, হাড়ের সাথে মাংস নেই এক তোলাও। বয়স বাড়লেই হাঁপানি আর পক্ষাঘাতগ্রস্থ হয়ে জরা-জীর্ণ জীবন। ভিক্ষা আর প্রতিদিন ধুকে-ধুকে মরা ছাড়া যেন আর কিছুই করার থাকে না। এক টুকরো কাফনের কাপড় যোগাড় হয় মানুষে মনের গভীর তিক্ততায়। ঘুন্টিঘরের আশপাশের দোকানদারগুলো দোয়া করতে থাকে, যেন দীর্ঘ-আয়ু লাভ করে বস্তির মানুষগুলো।

মরলেই তো চাঁদা দিতে হবে তাদের। কোনোকিছুই যেন বন্ধ থাকে না আত্মার অন্তর্ধান। মৃত্যুগুলো দ্রুত ঘটতে থাকে ক্ষুধা আর স্বপ্ন ভাঙার পথে। পাশের মানুষগুলো দীর্ঘ-নিঃশ্বাসে বলে, বেঁচে গেল চিরদিনের মতো। ভালোই হয়েছে। আসল ঠিকানায় চলে গেছে। এখানে কি কষ্টই না করেছে। এখন ওপারে আল্লাহ্ যেন শান্তিতে রাখেন।

কেউ আবার চোখে আগুন তুলে বলে, কেন রাখবে না। এপারেও কষ্ট দিয়েছে, ওপারেও কষ্ট দিবে না কি।

এই জীবন থেকে বেরিয়ে আসতে চায় কেউ কেউ। সব কিছু দিয়েও যেন

www.banglainternet.com

খোঁজে অন্য জীবনের পথ। তখনি কালা আর চুমকির মতো হতে হয় ওদের। কেউ আসল পথ দেখায় না। আরো যেন কৃষ্ণগহ্বরে ঢেকে দিতে থাকে সময়গুলো।

নতুন যৌবন লাগা চুমকিদের অক্ষত বাহু আর স্পর্শহীন বুকের খাঁচাটা চুম্বকের মতো টানে বুর্জোয়া সাহেবদের। আর নেতাদের পছন্দ কালা বিলুদের অকুণ্ঠিত বাহুর শক্তি। যেন তারা আদায় করে নিতে জানে টাকা আর ক্ষমতা। হাতের মুঠে থাকে পুলিশ আর ভ্রান্ত আইন সংস্থা।

সেদিনের মতো কথা শেষ হলে বেরিয়ে পড়লো ওরা। বৃষ্টি ঝরছে। লোডশেডিং শুরু হয়েছে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না এখানকার মানুষগুলোর। বনানীতে ধনীদের বাস। ইলেকট্রিসিটি ধরে রাখার সুব্যস্থা রয়েছে প্রত্যেকটি বাসায়। লোডশেডিং-এর সময় তা কাজে লাগানো হয়।

এখানেও যেন বৈষম্য। সময়মতো ইলেকট্রিসিটি ব্যবহার করবে আবার ধরে রাখবে যন্ত্রের মধ্যে। লোডশেডিং এর সময় তা ব্যবহার করবে। অথচ তাদের এই বাড়তি সুযোগ ভোগের কারণে আরো বেশি কষ্ট পাচ্ছে সাধারণ মানুষগুলো।

রুদ্রর হাতে একটি বই। বারান্দায় নেমে এসে আকাশের দিকে তাকালো সে। পিছনে দাঁড়িয়ে ইরা বলল, সবাই চলে গেছে। আপনার তো দূরে যেতে হবে। একটি পলেথিনের ব্যাগ এনে দেবো, বইটির জন্য?

ঈষৎ হাসলো রুদ্র। ইরার দিকে তাকালে মনটা যেন ভরে ওঠে শান্তি আর পবিত্রতায়। এতোটা বিলাসিতার মধ্যে বড় হয়েও মেহনতি মানুষের জন্য কাজ করছে ইরা। বিধাতা যেন পরিপূর্ণ করে তৈরি করেছে ওকে। বাহ্যিক রূপ, ঐশ্বর্য আর অন্তর সত্যে, সুন্দরে পরিপূর্ণ।

রুদ্র বলল, দিলে ভালোই হয়। বইয়ের সাথে মাথাটাও বেঁচে যায়।

ভ্রূকুটি করলো ইরা। দৃষ্টিতে প্রশ্ন?

বুঝলেন না তো। ব্যাগটি বইয়ের সাথে জড়িয়ে মাথার উপর ধরে রাখলাম।

হাসি ফুটলো ইরার মুখে। তার দ্রুত প্রস্থান। ব্যাগ এনে রুদ্রর হাতে দিয়ে বলল, খদ্দরে আপনাকে বেশ লাগছে।

ভালোই বলেছেন। দৈন্যতার কারণেই কেনা। না হলে আর একটু মিহি সুতোর কোনো কাপড়ই আমার পছন্দের ছিল।

তার কি খুব দরকার?

সত্যি তাই। আপনার টাকা আছে, তবুও সস্তা কাপড়... না সস্ত নয়,

সাধারণ কাপড় পরেন আপনি।

তাতে কি ভদ্রতা রক্ষা হচ্ছে না?

খুব হচ্ছে।

তাহলে তো মিটেই গেল। তার পর উদ্‌গ্রীব হয়ে ইরা বলল, শুনেছেন বোধ হয়। রেজাল্ট দিচ্ছে।

নিস্পৃহ কণ্ঠে রুদ্র বলল, কবে?

সামনের সপ্তাহে।

ও আচ্ছা। নিরুত্তাপ কণ্ঠে রুদ্র বলল।

রেজাল্টের খবরে তেমন কোনো আগ্রহ নেই মনে হচ্ছে?

আগ্রহ ... কি হবে?

সে পরে দেখা যাবে। এখন বাসায় যান তো। মা ভাববেন।

হাসলো রুদ্র। মায়ের কথাটা ওর মনে আছে। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি রুদ্রর চোখে। তাহলে চলি।

হাত নাড়লো ইরা। কবে দেখা হচ্ছে।

জানি না। তবে শীঘ্রই।

www.banglainternet.com

৫

আজ সূর্য ওঠার আগেই একটি কাণ্ড ঘটে গেল ঘুণ্টিঘরে। রাশিদার বাবার চিৎকার চেচামেচিতে সজাগ হয়ে উঠলো পুরো ঘুণ্টিঘরের মানুষ। তখনো আলো ফোটেনি প্রকৃতির মাঝে। প্রথমে বালিশে মাথা গুঁজে রাশিদার বাবার চিৎকার না শোনার ভান করছিল মানুষগুলো। এতো প্রত্যেকদিনই ঘটছে। কিন্তু রাশিদার বাবার আকাশবিদারি চিৎকার অদ্ভুত এক হাহাকারের মতো করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো বস্তির প্রতিটি গলিপথে। তার সবটুকু আবেদন আঁধারে মিশে যেন এঁকে দিচ্ছে কষ্টের কঠিন দাগ।

একটু পরেই রাশিদার বাবার কান্নার সাথে যোগ হলো আরো দু-তিনটি নারী কণ্ঠ। বিলাপ করে চিৎকার করছে তারা। দুঃখি মানুষের কণ্ঠের স্বর বড় করুণ, হৃদয়গ্রাসী আর বিলাপের সবটুকুই যেন বিধাতার কাছে নিবেদন।

আজ রাত করে ঘুমিয়েছিল রুদ্র। হৈ চৈ শুনে উঠে বসলো। উঁকি দিয়ে দেখলো মা নেই। প্রতিদিন এই সময় নামাজ শেষ করে অজিফা পাঠ করেন মা।

দ্রুত উঠে বাইরে চলে এলো রুদ্র। মানুষ মারা গেলেও হয়তো এতোটা ভিড় হয় না। তাহলে কি কেউ মারা গেল? কিন্তু রাশিদার বাবা চিৎকার করবে কেনো?

রাশিদাদের ঘরের সম্মুখে এসে দাঁড়ালো রুদ্র। ঘরের সম্মুখে এক চিলতে জায়গা। সেখানে গাদাগাদি করে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। কোনো রকমে বিলি কেটে ভিতরে গেল রুদ্র। দৃষ্টি যেন থিতলে গেল মুহূর্তেই। রাশিদা পড়ে আছে মাটিতে। মাথার কাছে বসে নিজের বুকে নিজেই থাপ্পড় দিচ্ছে আর অশান্ত দেহ নিয়ে বিলাপ করে যাচ্ছে, আমার মাইয়াডারে মাইরা হালাইছে ভদ্দনোকের বাচ্চারা। পশুরে পশু। এমনে মানুষ মারে। ও মা, মা গো চোখ খোল। আর কামে পাডামুনা তোরে। না খাইয়া মইরা যামু, ভিক্ষা করমু। তবুও কামে দিমু না, ও মা...।

রাশিদার বাবার দিকে তাকানো যাচ্ছে না। সমানে ঝরছে চোখের জল আর দৃষ্টিতে গভীর হতাশা, অভিযোগ আর নিরাশা। এখনো যেন ঘোর কাটেনি রুদ্রর। কি করবে বুঝতে পারছে না। আগের মতো হলে হয়তো সবার সাথে দাঁড়িয়ে দুঃখ প্রকাশ করে ভুলে যেতো সব। কিন্তু এখন তো কিছু একটা করা দরকার।

এতোক্ষণ মরিয়ম বেগম নীরিক্ষণ করছিলেন ওর পোড়া জায়গায়। পিছে, পেটে, হাতে, বুকে পুড়ে গেছে। মনে হচ্ছে চারকোণা কোনো তামা আগুনে লাল করে ঠেসে দিয়েছে কোনো অমানুষ। মরিয়ম বললেন, ওকে ঘরে নিয়ে চল। কেউ একজন গিয়ে ডাক্তার ডেকে নিয়ে এসো।

চুমকি সাহায্য করছে মায়ের সাথে। কালা, বিলু, বুলেট, অমল, নুরু ওরা সবাই চলে এসেছে। লাল চোখ দু'টি হাতের তালুতে ডলে নিয়ে সম্রাট বলল, আব্বে কালা এই সক্কাল বেলাই কি হইছে বে, মানুষ মরছে নি হি?

কালা বলল, এই দিকে আয় হালা মদারু। দেক বে কেমন মারছে রাশিদারে।

আরে বেটা গরিবরে সবাই মারে। আল্লাহ্ বি মারে আর মাইনসে...। তার পর সম্রাট বলে উঠলো, ওর বাপরে কত কইরা কইছি, পিচ্চি মাইয়া সাহেব গো বাড়িতে বি কামে দিও না। দরকার হইলে গার্মেন্টে পাঠাও। কার কতা কে হোনে, বুচ্ছস না।

মুহূর্তেই বিদ্যুৎ খেলে গেল রুদ্রর সমস্ত শরীরে। ওরে মেরে এরকম করছে। বাসায় কাজ করতো রাশিদা। ভিড় ঠেলে রাশিদার বাবাকে ধরলো রুদ্র। বিলু, কালা ওরাও এসে দাঁড়ালো সবাই। সব শুনতে লাগলো রুদ্র। কি হয়েছিল রাশিদার।

আগে মাঝে-মাঝেই মারধর করতো রাশিদাকে। কত বার সে বলেছে, বাবা আর কামে যামু না আমারে মারে। কিন্তু কি করবে। সংসারে রাশিদা ছাড়া আর কেউ নেই ওনার। রাশিদার মা মারা যাবার পড় কারখানায় কাজ করতে গিয়ে পঙ্গু হয়ে গেছে রাশিদার বাবা। সেখান থেকে কোনো ক্ষতিপূরণ পাওয়া যায়নি। তাই ভিক্ষা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই তাদের। বাধ্য হয়েই ছোট মেয়েকে মানুষের বাসায় কাজ করতে দিয়েছে। তাতেই দু'বেলা খাবার জুটতো তার। গত রাতে বাড়ির বৌটা খুব করে মেরেছে, খুনতি দিয়ে স্যাঁকা দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে। রাতে পালিয়ে কোনো রকমে বস্তি পর্যন্ত এসেই উঠোনে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে সে।

সব শুনে মাথা যেন ঠিক নেই রুদ্রর। এরা কি মানুষ! টাকা হলেই কি

www.banglainternet.com

সভ্য হয় মানুষ? এর চেয়ে বর্বর অসভ্যতা আর কি হতে পারে? এ যে প্রগৈতিহাসিক যুগকেও হার মানায়।

একটি ব্যাপার অবাক হয়ে ভাবতে লাগলো রুদ্র। এতগুলো লোক এখানে কিন্তু কেউ বিচার চাইছে না দোষীদের। শুধু বলছে, রাশিদাকে বাঁচাতে। কেউ বলছে না ওদের পুলিশে ধরিয়ে দাও। ওদের বিরুদ্ধে মামলা করো। ওদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দাও। এমনি কি কালা, বিলু ওরাও নিস্পৃহ। শুধু দুঃখ করছে আর অভিশাপ দিচ্ছে সবাই।

আসলে ক্ষুধা, দারিদ্রতা আর সরকারগুলোর কাছ থেকে সুবিধাবঞ্চিত হতে-হতে এদেশের প্রায় ষাট ভাগ মানুষ ভুলে গেছে বিচার আর অধিকার চাইবার কথা। অর্জনের কথা। তারা যে এ দেশের নাগরিক, তারা যে মানুষ তা যেন মনেও আনতে চায় না কখনো। সমাজ ব্যবস্থা তাদের এমন ভাবে ভুলিয়ে রেখেছে, যেন এটাই স্বাভাবিক। গরিবের জন্য আবার আইন কি? এরা চাকর বাকর হয়েই থাকবে ধনিদের। কারণ এদেশের সরকার, আইন, পুশিল সবই বুর্জোয়া শ্রেণীর দখলে।

সরকার মানুষের মনে একটি বদ্ধমূল ধারণার জন্ম দিয়েছে, এদেশে গরিবের কোনো অধিকার নেই। তার প্রতি অন্যায়ের কোনো বিচার নেই। প্রত্যেকটি জায়গায় চলছে টেলিফোন আর টাকার খেলা। থানায় মামলা এন্ট্রি করতে গেলে টাকার দরকার, উকিলের কাছে গেলে কাড়ি-কাড়ি টাকা ছাড়া কথাই শুনতে চাইবে না। সরকার পক্ষের উকিল জনগণের কথা শোনে না। টাকা খেয়ে যা খুশি তাই করে। মানবাধিকার সংস্থাগুলোও স্বাধীন নয়। বিচার ব্যবস্থার এবং আইনপ্রণেতাদের নিয়ন্ত্রণ করে ক্যাপিটালিস্টরা। তাই সেখানে সাধারণ, বিশেষ করে ক্ষুধার্ত মানুষগুলো খুবই নগ্নভাবে হচ্ছে সুবিধা বঞ্চিত।

সবার দিকে তাকিয়ের রুদ্র বলল, আমরা মামলা করবো। থানায় যেতে হবে। চলো সবাই।

সকলেরই চোখে ভয়। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে রইল সবাই। থানায়! বলে কি? কালা বলল, ঐ হানে যাইয়া কি হইবো।

রুদ্র বলল, কি হইবো মানে। এতো বড় একটি অন্যায় হলো আর কোনো বিচার হবে না?

সবাই যেন নতুন কথা শুনছে। সবার চোখ স্থির। এর আগে কত মানুষকে মেরে ফেলা হলো, কোনো বিচার হলো। আর রাশিদা তো এখনো বেঁচে আছে।

রুদ্র বুঝলো ওদের বুঝিয়ে বলতে হবে। বলল, ভায়েরা সবাই শোনেন।

আমাদের অধিকার আমাদেরই অর্জন করতে হবে। আমরা যদি এক থাকি তাহলে কেউ মারতে ধরতে পারবে না আমাদের। আর যদি প্রতিবাদ না করি তাহলে এভাবেই মরতে হবে আমাদের। আপনারা ভুলে যাচ্ছেন, দেশে আইন আছে। আমাদের আইনের আশ্রয় নেয়া উচিৎ।

রাশিদার বাবার চোখে ভয়। বাবা আইন কি আমাগো লাইগা। শেষে প্রাণটাই না যায়।

রুদ্র বলল, প্রাণ কি আছে আমাদের? একে বেঁচে থাকা বলে? চলো সবাই। ঘুণ্টিঘরের সব কিছু বন্ধ থাকবে আজ। কেউ রান্না করবে না। এর প্রতিবাদ করতে হবে।

মুহূর্তেই জনগণের মধ্যে একটি গুঞ্জন শোনা গেল। ঠিকই বলেছে রুদ্র। সবারই যেন একমত। এরই মধ্যে গলিমুখে থামলো একটি পুলিশের গাড়ি। একজন অফিসার দ্রুত নেমে এসে বলল, কি হচ্ছে এখানে?

মুহূর্তেই যেন চুপ সবাই। রুদ্র বলল, বাসায় কাজ করতে যাওয়া একটি মেয়েকে গত রাতে আগুনের স্যাঁকা দিয়েছে সাহেবরা। তার জন্য এক হয়েছি।

কিছুটা শ্লেষ জড়ানো কণ্ঠে পুলিশ বলল, তাতে কি, ঔষধ খাওয়া, ঠিক হয়ে যাবে। কোনো রকম ঝামেলা করবি না। এই কালা সব সরা এখান থেকে।

মুহূর্তেই খুন চেপে গেল রুদ্রর মাথায়। কুক্তার বাচ্চারে শেষ করে দেয়া উচিৎ। তুই-তুকারি করছে। রুদ্র বলল, আমরা কোনো জটলা করছি না, মিটিং করছি না। মেয়েটিকে নিয়ে থানায় যাচ্ছি।

থানায় কেন?

মামলা করতে।

তুই কি নেতা?

ভদ্রভাবে কথা বলুন।

এই ছেমরা তোর কাছে ভদ্রতা শিখতে হবে। মাইরা নেতামী শিখাইয়া দিমু।

আমি নেতা নই। আপনি কিন্তু খুব অভদ্রতা করছেন।

তবে রে, হাত বাড়িয়ে রুদ্রর কলার ধরলো পুলিশ। মুহূর্তেই যেন প্রতিবাদ করে উঠলো সবাই। এগিয়ে এলেন মা। ওকে ছেড়ে দিন।

আপনি কে? কঠিন কণ্ঠে বলল পুলিশ।

আমি ওর মা।

www.banglainternet.com

ছেলেকে সামলে রাখবেন না হলে কিন্তু...

এরই মধ্যে দ্রুত চলে এলো অন্য একটি পুলিশ। কি করছেন, এখানে অন্য ঝামেলা করা ঠিক হবে না। আমরা যে কাজে এসেছি সেই কাজটি করা দরকার। ওকে ছেড়ে দিন।

তবুও যেন রাগ মিটছে না প্রথম পুলিশটার। কিন্তু বাধ্য হয়েই ছাড়তে হলো রুদ্রকে। তারপর বড়-বড় চোখ করে রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, নেতা হবার সখ হয়েছে। তোকে দেখে নেবো। ফকিন্নির বাচ্চা, আইন, মামলা, অধিকার...। এমন মারা মরবো বাপের নাম ভুলিয়ে দেব হারামির বাচ্চা।

রক্ত চড়ে গেল রুদ্রর মাথায়। কিন্তু সহ্য করতে হলো। ওরাই সব হারামির বাচ্চা। সারা দিনই হারাম খাওয়ার ধান্দা করে। হারামি পয়দা করে। খুব উগ্র দেখাচ্ছিল পুলিশটাকে। যেন জনগণের নিরাপত্তা না দিয়ে বরং জনগণের অনিরাপত্তার প্রধান কারণ এখন পুলিশ। মানুষ যেন পুলিশের চেয়ে সন্ত্রাসীদের বেশি বিশ্বাস করতে পারে। পুলিশ শব্দটির অর্থই ওরা জানে না। না হলে শব্দটি সম্পর্কে পুরোপুরি অসচেতন অনেকেই।

খানিকক্ষণ শাশিয়ে চলে গেল পুলিশ। বোঝাই গেল থানায় গিয়ে তেমন লাভ হবে না। কালা, বিলু ওরা বলল, ঐ বাড়ির হালারা টাকা খাওয়াই পুলিশের মুখ বন্ধ করছে। এহন উল্টা কতা কইতাছে। নইলে এই সাত সকালে বস্তিতে আইব ক্যান।

এবার সবার উদ্দেশে রুদ্র বলল, প্রিয় ভাইয়েরা, এভাবে আর কতদিন মার খাবো আমরা। এখনই সময় প্রতিবাদ করার। মুখ বুজে আর সহ্য করবো না আমরা। অনেক সহ্য করেছি। মরতে হলে এক সাথে মরবো। কিছু একটা করা দরকার আমাদের।

কালা বলল, গুরু মোস্তফা লিডারের কাছে যাইবা নি হি? মনে হইতাছে কাম হইবো।

রুদ্র বলল, কোনো লাভ নেই কালা। ওরা সবাই এক। বুর্জোয়ারা কখনো গরিবের বন্ধু হয় না। আমাদের অধিকার আমাদেরই বুঝে নিতে হবে। রোজ-রোজ কেউ এসে আমাদের শিখিয়ে দেবে না। আমাদের পাশে দাঁড়াবে না।

মুহূর্তেই যেন হৈ হৈ রব তুল্ল সবাই। রুদ্র যেন ঠিক কথাই বলছে। সবাই আছে তার সাথে। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছেন মা। ছেলের দিকে তাকিয়ে গর্বে বুক ভরে ওঠে তার আর আঁচলে চোখ মোছেন। কিসের যেন একটি ভয় হয়। পুলিশ কি ওকে ছেড়ে দেবে। পুলিশ বেটা বদের হাড্ডি। তবুও শত-শত মানুষ আজ রুদ্রর সাথে। সবাই তার কথা শুনছে।

একটু পরেই একটি গাড়ি এসে থামলো ঘুন্টিঘরে। গলির মুখের চা দোকান থেকে নেমে দ্রুত আসছে ধলু, মেয়েটি ওর পিছনে। সকলের দৃষ্টি ওদিকে। মুহূর্তেই সবার মধ্যে চাপা ক্ষোভ। ঐ যে আইছে, পুলিশ যাইয়া মনে হয় খবর কইছে। ইনি আইছে টাকা দিয়া মীমাংসা করতে। সকলেই যেন তেড়ে মারতে যাচ্ছে মেয়েটাকে।

ভাব খারাপ বুঝে দ্রুত গিয়ে সবার সামনে দাঁড়ালো রুদ্র। একবার শুরু হলে অনেক সমস্যা হবে। রুদ্র দেখলো, ইরা আসছে। ওরা ভুল করছে। রুদ্র বলল, আপনারা যা ভাবছেন ও সে নয়। সে আমার কাছে এসেছে।

শান্ত হলো সবাই। ভিড় ঠেলে ভেতরে ঢুকলো ইরা। কি ব্যাপার? প্রশ্নটা রুদ্রর দিকে।

রুদ্র বলল, আপনি?

সবাইকে খুব উগ্র দেখাচ্ছে। কি হয়েছে?

সংক্ষেপে ঘটানার বিবরণ দিল রুদ্র। এরই মধ্যে ইরার পাশে এসে দাঁড়ালেন মা। কি সুন্দর মেয়ে। একেবারে হাতে বানানো। কি সুন্দর ব্যবহার। মায়ের হাতটি ধরে হাসলো ইরা। এবার অনেকেই চিনতে পারলো তাকে। বস্তিতে এর আগেও এসেছে মেয়েটি।

একটু ভেবে ইরা বলল, থানায় গিয়ে মামলা করার চেয়ে যে কোনো সামাজিক সংগঠনের সাহায্য নেয়া গেলে ভালো হবে।

তাতে কি লাভ হবে? বলল রুদ্র। সবাই শুনবে ওদের কথা।

ইরা বলল, খুবই স্পষ্ট। আমরা যদি থানায় গিয়ে মামলা করতে চাই তাহলে সেই মামলা আমাদেরই চালাতে হবে। এই মেয়েটির মাললা চালানোর ক্ষমতা নেই। তাছাড়া যারা আসামী পক্ষের লোক তারা নিশ্চয়ই বসে নেই। টাকা খাইয়ে থানা হাত করে রেখেছে। আমাদের মামলা টিকবে না কোনোভাবেই। তার চেয়ে যদি কোনো সমাজিক সংগঠনের কাছে গিয়ে তাদের সাহায্য চাই নিশ্চয়ই সাহায্য করবে তারা। তাদের নিজস্ব উকিল রয়েছে, মামলা করতে হলে তারাই করবে। এতে আমরা সঠিক বিচার পেতে পারি।

ইরার কথা পছন্দ হলো রুদ্রর। তার সাথে সবাই একমত হলো। ঠিক কথাই বলেছে। পুলিশের সমস্যা তারা মোকাবেলা করবে। আইন-আদালত তারাই ভালো বোঝে। এদেশে আইন-আদালত সব ধনিদের জন্য। গরিবের জন্য কোনো আইন আদালত নেই এদেশে।

ইরার বুদ্ধি মতোই কাজ করা হলো। সামাজিক একটি সংগঠনের কাছে

www.banglainternet.com

নিয়ে যাওয়া হলো মেয়েটাকে। তারা আন্তরিকতার সাথেই দেখবে বলে আশ্বাস দিল। সেদিনই মামলা করার প্রস্তুতি নেয়া হলো।

সেদিন শুধু ঘুণ্টিঘরেই নয় আশপাশের এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়লো এই ঘটনা আর রুদ্রর নাম। সবার মুখে প্রশংসা আর নির্ভরতা রুদ্রর উপর। কিন্তু কেউ-কেউ চক্রান্ত শুরু করলো রুদ্রকে নিয়ে। আবার কেউ-কেউ দলে টানতে চাইল।

সন্ধ্যার পরে বস্তিতে ঢুকলো আওয়ামী লীগের ফিরোজ ভাই। সরাসরি রুদ্রদের ঝুপড়ির সম্মুখে। আজ আর কালার খোঁজ করেনি সে। কালা এখন অন্য দলে হাঁটে। তাই রুদ্রকে যদি দলে টানা যায় তাহলে এখানে একটি অবস্থান থাকে তার। বাইর থেকে কে একজন ডাকলো, রুদ্র, রুদ্র কি ঘরে আছে, ফিরোজ ভাই এসেছে দেখা করবে।

নামটা অজানা নয় মায়ের। ভেতর থেকে দৌড়ে রুদ্রর ঘরে চলে এলেন মা। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বই পড়ছে রুদ্র। মাকে দেখে উঠে বসে বলল, আমি দেখছি।

মায়ের চোখে উদ্বেগ। বাইরে এসে ছালাম দিল রুদ্র। ভাই আপনি?

ওলাইকুম আচ্ছালাম। তোমায় ধন্যবাদ দিতে এলাম।

চলেন ভিতরে গিয়ে বসি।

একটি টেয়ার টেনে বসল ফিরোজ ভাই। বাকি সবাই দাঁড়িয়ে আছে। হাতের ইশারায় ওদের বাইরে যেতে বলল ফিরোজ ভাই। সবাই বাইরে গেলে ফিরোজ ভাই বলল, তুমি আজ যে কাজটি করেছ সত্যি সেটা খুব প্রশংসার যোগ্য। সব শুনেছি আমি।

সরল কণ্ঠে রুদ্র বলল, এমন আর কি করেছি। এটা তো সবারই করা উচিৎ।

ঠিক বলেছ। তবে শিক্ষিত আর সাহসী না হলে এই সব কাজ করতে পারে না।

হাসল রুদ্র। লোকটা আসলে কি চায়। উদ্দেশ্য ছাড়া ওরা তো এতোটা গায়ে পড়ে কথা বলবে না। বলল, আমি আমার কর্তব্য করেছি। এর চেয়ে বেশি কিছু নয়।

তা ঠিক। শুনলাম তোমার রেজাল্ট তো ভালো হয়েছে, কোন কলেজে ভর্তি হবে।

জানি না।

বলছ কি! এই রেজাল্ট নিয়ে যে কোনো ভার্সিটিতে চান্স মিলে যাবে।

তুমি চাইলে আমিই ব্যবস্থা করে দিতে পারি।

একটু ভাবল রুদ্র। তাহলে এই কথা। মেয়েটির কোনো খোঁজ না নিয়ে আমার উপকার করতে এসেছেন তিনি। বলল, তার দরকার হবে না।

কেনো?

ভর্তি নিয়ে এখনো কিছুই ভাবছি না। দেখা যাক কি হয়।

তুমি আমাদের দলে চলে এসো। সরাসরি বলল ফিরোজ ভাই।

রুদ্র বলল, পুঁজিতন্ত্রের বৈষম্য ভরা এই রাজনীতি আমাকে দিয়ে হবে না। আমি এসব পছন্দ করি না।

সেই জন্যই তো তোমাকে দলে প্রয়োজন। তোমাদের মতো ইয়াং আদর্শ দলে প্রয়োজন। তোমরাই সব ঠিক করতে পারবে।

একটু ভেবে দেখি।

অবশ্যই ভেবে দেখবে। তবে সুযোগ বারবার আসে না। তাহলে আমি উঠি। তোমার মা-কে আমার ছালাম বলো।

বসেন ভাই একটু চা খেয়ে যাবেন।

না না রুদ্র। আর একদিন। তুমি পার্টি আফিসে এসো। সবার সাথে পরিচয় করিয়ে দিবো।

ঈষৎ হেসে ফিরোজ ভাইকে বিদায় জানালো রুদ্র। তারপর আবার এসে গা এলিয়ে দিল নিজের বিছানায়। আজ আর সন্ধ্যায় বের হবে না সে। ভেতরের ঘরে পাটি বিছিয়ে বসেছেন মা। একটু পরেই ছেলেমেয়েরা আসবে, ওদের আদর্শলিপি পড়ান মা।

কার্ল মার্কসের বইটিতে মন দিতে পারছে না রুদ্র। কালা, বিলু, বুলেট ওরা খুব সমস্যার সাথে জড়িয়ে পড়ছে আজকাল। এখনো বুঝতে পারছে না ওরা। ওদের দিয়ে বিভিন্ন অফিসে টেন্ডারবাজি করাচ্ছে মোস্তফা মল্লিক। সে কামাচ্ছে কোটি-কোটি টাকা আর ওরা পাচ্ছে সামান্য কিছুই। তাতেই ওরা খুশি।

কালা, বিলুদের পরে নুরু, শিমুল ওরা মাস্তানির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। সেদিনের ছেলে এখনই মদ খেয়ে খিস্তি করে গলি, মোড়ে দাঁড়িয়ে। মাস্তানির প্রথম ট্রেনিংই হচ্ছে মাল খেয়ে খিস্তি করা। এভাবেই হয়তো চলতে থাকবে। ওদের বোঝানো দরকার। এসব সমাজবিরোধী কাজ করে কেউ কিছু করতে পারে না। তাছাড়া গরিবরা শুধু ব্যবহার হয় চিরকাল।

এর মধ্যে বিলু আর কালার মধ্যে তুমুল ঝগড়া হয়েছে টাকা-পয়সার ভাগ নিয়ে। হয়তো খুনোখুনি হয়ে যাবে। ওদের এই পথ থেকে সরিয়ে আনা

www.banglainternet.com

দরকার। কিন্তু কি করে সম্ভব। যদি কোনো কাজের ব্যবস্থা করা যেতো...। কিন্তু কি কাজের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তাছাড়া এই ঢাকা শহরের পথে ঘাটে নাম পরিচয়হীন কালা, বিলুর অভাব নেই। ওদের ক'জনকেই বা সঠিক পথে আনা সম্ভব। ভেবে-ভেবে যেন কূল খুঁজে পায় না সে।

সময়টা যেন ধনীদের হাতে বন্দী। প্রত্যেকটি জায়গা এমনভাবে তারা দখল করে নিচ্ছে, গরিবদের না খেয়ে মরে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

সেদিন বড় আক্ষেপ করছিল লাবলু। পার্কে-পার্কে ঘুরে ঝালমুড়ি আর বাদাম বিক্রি করে ছেলেটা। কিন্তু এখন না কি মানুষ আর খোলা ঝালমুড়ি খেতে চায় না। সেখানেও বুর্জোয়াদের দৌরাত্ম্য। বড়-বড় কোম্পানিগুলো ঝালমুড়ি আর বাদাম সুদৃশ্য এয়ারটাইট প্যাকেটে বাজারজাত করছে। তাই খোলা ঝালমুড়ি কেউ খেতে চায় না।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে পুঁজিতন্ত্রের আগ্রাসী থাবা। শিক্ষা, সংস্কৃতি, ব্যবসা-বাণিজ্য, রাজনীতি, সামাজিক সব ক্ষেত্রেই যেন অর্থ এবং আর্থিক সম্পর্ক জড়িত। তাই তো সমাজের এতোটা অবক্ষয়। এসব বৈষম্যের কারণে কর্মবিমুখ হচ্ছে গরিবেরা। শুধু মাত্র চাকর ছাড়া তেমন কোনো কাজ নেই তাদের সামনে। যেন বিশাল এক বটবৃক্ষ ধীরে-ধীরে ঢেকে দিচ্ছে সূর্যটাকে। এক সময় শুধু অন্ধকার। যতদিন না সেই গাছের শিকড় উপড়ে ফেলা না যায়, ততদিন বৃক্ষের নিচের মানুষগুলো অন্ধকারেই পচে মরবে।

এই বিশাল বৈষম্য থেকে মানুষকে বেরিয়ে আসতেই হবে। তার জন্য বিপ্লব দরকার। প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে বৈষম্য। তাহলে স্বাধীনতা কেন। পাকিস্তানিদের বৈষম্যের কারণে দেশ স্বাধীন হয়েছিল। সেই বৈষম্য এখন আরো বেশি তীব্র আর অসহ্য হয়ে উঠেছে। সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। মানুষের বোধ জাগিয়ে তুলতে হবে। সুদখোর, ঘুষখোর, কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ওদের বিলাসিতার জন্য জীবন দিচ্ছে গরিব মানুষ। অথচ এর কোনো বিচার নেই। দেশের সরকারগুলো যেন টাকার কাছে বন্দি হয়ে বিবেকহীন হয়ে আছে।

মাঝরাত অবধি ভেবে-ভেবে কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ে রুদ্র। মা আর ডাকে না ছেলেকে। সকালে এসে হাজির হয় ইরা আর আদিত্য ভাই। তখন নাস্তা করছিল মা আর ছেলেতে মিলে। ডাল আর রুটি। ইরা এসে খেতে বসলো ওদের সাথে। মা ওর মুখে হাত বুলিয়ে বলে, তুমি কি এসব খেতে পারবে মা।

কেন পারবো না মা। আপনার রান্না আমার ভালো লাগে।

আদিত্য বসলো মায়ের পাশে। ভালো আছেন মা?

ভালো। তুমি কেমন আছ বাবা?

ভালো আছি।

আমার খুব ভয় করছে?

কিসের?

ছেলের দিকে তাকিয়ে মা বলে, তোমরা কি সব নিয়ে কাজ করছো বাবা। তোমাদের কি ছেড়ে দিবে ওরা।

হাসলো আদিত্য। আমরা তো চাই আমাদের মেরে ফেলুক। সোভিয়েত ইউনিয়নে জার সরকার যখন কবি-সাহিত্যিকদের নির্মমভাবে হত্যা করলো, তখনই তার পতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমাদের এগিয়ে যেতে হবে মা। অনেক মানুষ আছে আমাদের সাথে। তারা কাজ করতে পারছে না। কিন্তু সময় এলে ঘরে বসে থাকবে না।

মা হাসেন। বলেন, তোমরা কোনো অন্যায় করবে না তা আমি বিশ্বাস করি।

দোয়া করবেন মা। এই দেশেটার মানুষগুলো বড় অসহায়। মনের কথাটা বলার মানুষটাও নেই। রাষ্ট্র যেন বিকল, কিছু মানুষ শুধু লুটে নিচ্ছে সব। কেউ কিছু বলছে না।

মা বললেন, তোমারা এলে ভালো লাগে।

ইরার হাতে একটি কাগজ। রুদ্র বলল, ওটা কি?

উদ্‌গ্রীব হয়ে ইরা বলে, আপনার ভর্তি পরীক্ষার ফর্ম।

নিস্পৃহ রুদ্র। হাসেন মা। বলেন, ভালোই করেছ। এতো ভালো রেজাল্ট করে ঘরে বসে থাকবে কেনো। একটি মিষ্টিও কাউকে খাওনো হলো না। বলে, এতে খুশি হবার কিছু নেই। যদি মানুষের পেটে ভাতের ব্যবস্থা করা যায় সেদিন খুশি হবো। সার্টিফিকেট অনেকেরই আছে। আমি চাই বড় শিক্ষিত হোক রুদ্র।

ইরা বলল, ঠিক বলেছেন মা। তাই নিয়ে এলাম। নিশ্চই চান্স পেয়ে যাবেন আপনি।

রুদ্রর মনে দ্বিধা। আদিত্য বলল, কোনো কথা নয়। কোনো রকম ভুল করা যাবে না। পড়াশুনা করতেই হবে।

তবে কি আমি পড়াশুনা করছি না! কিছুটা বিস্ময়ের সাথে বলল রুদ্র।

করছেন। কিন্তু একাডেমিক কোয়ালিফিকেশনেরও প্রয়োজন রয়েছে।

www.banglainternet.com

ভুলে গেলে চলবে না আমরা কাজ করছি সমাজের শক্তিশালী একটি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। কথাগুলো বলল ইরা।

কিছুটা উগ্র হলো রুদ্র। শক্তিশালী! সুদখোর, ঘুষখোর, আড়ৎদার, মজুদদার, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা, সমাজবিরোধীরা কি শক্তিশালী ইরা?

আপাতত তাই।

না, মানতে পারছি না। আমরা নিজেরা দুর্বল হয়ে গেছি। আমাদের ইমান, বোধ নষ্ট হয়ে গেছে। তাই টাকাকে বিধাতার চেয়ে বড় ভাবছি।

বাস্তবতাকে অস্বীকার করা বোকামী। যতদিন না সমাজ থেকে এসব অভিশাপ দূর করা যাচ্ছে, ততদিন আমাদের বাস্তবতা মেনেই চলতে হবে।

দু'জনের মধ্যে তুমুল তর্ক শুরু হয়। ওদের কথা শোনেন মা। অনেক কথাই বোঝেন না। তবুও যেন ভালো লাগে। কত সুন্দর সব যুক্তি দিয়ে কথা বলে ওরা। ওরাই পারবে একদিন নতুন সূর্য জাগাতে।

শেষ পর্যন্ত ফর্মটা পূরণ করলো রুদ্র। ভর্তি পরীক্ষায় বসতে হবে ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে। খুশি যেন ধরে না মায়ের মুখে। আদিত্য বলল, তুমি ভর্তি হতে পারলে সেখানে আমাদের বড় একটি প্লাটফর্ম তৈরি হবে।

৬

হেমন্তের সকাল। স্নিগ্ধ আর শান্ত, প্রসন্ন আকাশ। এখনো কর্মব্যস্ত হয়ে ওঠেনি ঘুণ্টিঘরের মানুষগুলো। ঘুম লেগে আছে প্রতিটি ঝুপড়িতে। সারা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে সন্ধ্যায় জীবনের সকল লেনদেন মিটিয়ে অর্ধাহারে অনাহারে মলিন মুখ বালিশে গুঁজে অপেক্ষায় থাকে আর একটি তিক্ত দিনের।

সূর্য যেন সবগ্রাসী। ক্ষুধা উদ্রেককর। এ যেন ব্যাকুল নিরর্থক জীবনের আয়োজন। বুকের হাড় তোলা মানুষগুলোর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটাছুটি আর রূপবিক্রি করা মেয়েগুলো যেন রূপ-নিঙড়ানো ছিবড়ে ক্লান্ত আবসন্ন শরীরে নির্ঘুম বিছানায় গড়াগড়ি দেয়।

তবুও আজ যেন ভালো লাগছে সকালটা। মেঘ মুক্ত আকাশ। সদ্য ধবল মেঘেরা মায়ায় ভরে রেখেছে পৃথিবীকে। এ যেন অনন্ত দিনের গান আর কিন্নরী সুর তোলা কোনো গীতি কবিতা। দ্রুত বেরিয়ে কল সেন্টারে চলে এলো রুদ্র। ইরার সেল ফোনে কল করতেই ওপাশ থেকে ভেসে এলো, হ্যালো... ঘুমে জড়ানো কণ্ঠ।

আমি রুদ্র?

বুঝেছি। এতো সকালে?

শুভ জন্মদিন।

ভুলেই গিয়েছিলাম। মনে করিয়ে দেবার জন্য ধন্যবাদ।

আজ কি দেখা হতে পারে?

আজ কেন, এখনি হতে পারে।

কোথায়?

কয়েক মুহূর্ত ভেবে ইরা বলল, টিএসসি-তে চলে আসুন। এক সাথে নাস্তা করা যাবে।

আমি এখনি যাচ্ছি।

বাসায় না ফিরেই সোজা বাস ধরলো রুদ্র। কিছু একটি দেয়া দরকার।

www.banglainternet.com

কিন্তু কি দিবে। যদি রক্তকরবী আথবা চন্দ্রমল্লিকা দেয়া যেত তাহলে খুব ভালো হতো। নিজের মনেই হাসলো রুদ্র। রজনীগন্ধা আর নজরুল গীতির একটি রেকর্ড কিনে দেয়াই ভালো। একটি বই দেয়া যেতো। কিন্তু এখন নয়। বই কিনতে অনেক সময় লেগে যাবে।

শাহবাগ মোড় থেকে নজরুল গীতির রেকর্ড আর ফুল কিনে দাঁড়িয়ে আছে রুদ্র। ইরা এলো। গাড়ি পার্ক করে এসে দাঁড়ালো রুদ্রর সম্মুখে। এই মেয়েটার সরল দৃষ্টি সত্যিই খুব অদ্ভুত।

কেমন আছেন? বলল ইরা।

ভালো। আপনি?

ভালো।

ফুল আর নজরুল গীতির রেকর্ডটি এগিয়ে দিল রুদ্র। হাসি মুখে সেগুলো গ্রহণ করে ইরা বলল, সূর্য উঠার সাথে-সাথে যে দেশের মানুষের ভাতের চিন্তা করতে হয়, সে দেশে জন্মদিন পালন করা একটি বিলাসিতা। তাই আমি আমার জন্মদিন বিশেষভাবে মনে রাখি না। তবে আজ আপনার কাছ থেকে এই অমূল্য উপহার আমার ভালো লাগছে।

আপনাদের বাসা থেকে কি আপনার জন্মদিন পালন করা হয় না?

এক সময় খুব ধুমধাম করে হতো। পাঁচতারা হোটেল থেকে খাবার যেতো। মদের আড্ডা বসতো। কিন্তু এখন আর হয় না। আমি বলে দিয়েছি এগুলো ভালো লাগে না আমার।

কিন্তু আপনি যে বুর্জোয়াদের গাড়ি ব্যবহার করে তাদের পিছু লেগেছেন, এটা কি ঠিক হচ্ছে?

কেনো নয়। এটাই তো ভালো, শত্রুর অস্ত্র নিয়ে ওদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ। ঈষৎ হাসলো ইরা।

ভালোই বলেছেন। ভেতরে ঢুকে কি রেজাউল স্যারের সাথে দেখা করবেন?

না, এখন নয়। বিকেলে দেখা হবে সবার সাথে। এখন চলুন নাস্তা করতে হবে।

কোথায় যাবেন?

যে কোনো রেস্টুরেন্টে।

চলুন নীলক্ষেতের দিকে যাই।

চলুন।

ওরা এসে বসলো একটি রেস্টুরেন্টে। দোকানে প্রচণ্ড ভিড়। ব্যস্ত সময়

কাটাচ্ছে দোকানীরা। ইরা বলল, কি খাবেন?

ডাল আর রুটি।

ডিম খেতে পারেন আমি খাওয়াবো।

কেনো, স্পেশাল ডে বলে?

ধরুন তাই।

ঠিক আছে, খাওয়া যায়।

বারো-তের বছরের একটি ছেলে এসে দাঁড়ালো টেবিলের সম্মুখে। গায়ে ছিন্নবস্ত্র, চোখ মুখ মলিন আর বিরক্তির ছাপ। খাবারের অর্ডার দিল ইরা। আশপাশে টেবিল থেকে কয়েক জোড়া চোখের লোভী দৃষ্টি ইরার উপর। যেন কোনোদিন মেয়ে মানুষ দেখেনি। এই প্রথম!

রুদ্র বলল, এখনো মেয়েদের উপর পুরুষের দৃষ্টি এতোটা সহজ হতে পারেনি।

ইরা বলল, পুরুষ নয়। বলুন নষ্ট পুরুষগুলো, দৃষ্টিতে যেন বিষ মেশানো।

ঈষৎ হাসলো রুদ্র। মজা করে বলল, সুন্দরের দিকে মানুষের দৃষ্টি চিরকালই অসহায়। রাগ করবেন না।

সুন্দরকে দেখতে হলে সুন্দর মন লাগে, দৃষ্টিতে পবিত্রতা থাকতে হয়। কিন্তু ওদের দৃষ্টিতে তা নেই।

একটু হেসে উদাস তাকিয়ে রইল রুদ্র। ইরা বলল, কি ভাবছেন?

ছেলেটাকে দেখেছেন?

কোন ছেলেটা?

এই যে আমাদের পরিবেশন করছে।

দেখলাম, কিন্তু কেনো?

এই বয়সে জীবনের কঠিন বাস্তবতার সাথে যুদ্ধ করে চলেছে।

পেটের দায়ে।

হুঁ। পেটের দায়ে পঙ্গুত্ব।

কেনো?

এটা এমন কোনো কাজ নয় যে এর ভবিষ্যৎ আছে। একটু বড় হলে হয়তো অন্য কাজে নামবে, হতে পারে সেটা সমাজবিরোধী।

ক্ষুধা মানুষকে ভ্রান্ত পথে যেতে প্ররচিত করে, নৈতিকতার অবক্ষয় ঘটায়।

জানেন ইরা, আমার মনে হয় কিছু শব্দ আমাদের দেশের অনেক মানুষ থেকে দূরে।

www.banglainternet.com

খাবার চলে এসেছে। একটু রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে ইরা বলল, কি রকম?

বোধ, নৈতিকতা, মানবতা, সত্য, সুন্দর, সরলতা এগুলো যেন ভুলে গেছি আমরা।

ঠিক ভুলে যাইনি। আমরা বুঝতেই পারি নি কখনো। জন্ম থেকে যারা চরম বৈষম্য স্বীকার হচ্ছে তারা কিন্তু তাতেই অভ্যস্থ হয়ে পড়ছে। রাষ্ট্রের ওপর যে আমাদের কোনো অধিকার রয়েছে তা ভুলে গেছে তারা। ঠিক তেমনি, একটি শিশু বেড়ে ওঠার সাথে সাথে দেখছে সর্বক্ষেত্রে অব্যবস্থাপনা। স্কুল থেকে শুরু করে মিনিস্ট্রি পর্যন্ত। প্রত্যেকটি সেক্টরে দুর্নীতি। তখন সেটাকেই গ্রহণ করতে হচ্ছে তাকে। মনে করছে এটাই বুঝি স্বাভাবিক। কোনো বাঙালি শিশুকে তার জন্মর পর যদি কুড়ি বছর পর্যন্ত চীনা ভাষায় তার সাথে কথা বলা হয়, তাহলে সে কিন্তু চীনা ভাষাতেই অভ্যস্ত হবে। এবং মাতৃভাষা হিসেবে গ্রহণ করবে। আমাদের অবস্থাটা হয়েছে ঠিক তেমনি।

তাহলে কি করবো আমরা?

আপনি কিন্তু পেসিমিস্টদের মতো কথা বলছেন। আপনাকে অন্তত মানায় না।

স্যরি। মাঝে-মাঝে সত্যিই হতাশ লাগে।

এর বিরুদ্ধেই তো আমরা কাজ করছি। মানুষগুলোকে বোঝাতে হবে। এভাবেই গণবিপ্লব সম্ভব। অন্য কোনো উপায় নেই।

খাওয়া শেষ করে রমনায় গিয়ে বসল ওরা। ইরা বলল, আজাকের দিনটার শুরু হলো ভারি সব কথা দিয়ে। কেমন তেঁতো লাগছে মনটা।

তাহলে কি করতে পারি মন ভালো করার জন্য?

একটু ভাবল ইরা। চোখের তারায় হাসি। চুলগুলো দুলছে মৃদু বাতাসে। শান্ত ভিজে বাতাস। দূরে কোথাও হয়তো বৃষ্টি ঝরছে। ইরা বলল, একটি কবিতা শোনাবেন?

কবিতা, আমি?

আপনি ভালো আবৃত্তি করেন। লিখছেন না কেনো?

কি হবে লিখে। সেখানেও তো বুর্জোয়াদের দৌরাত্ম্য। টাকা ছাড়া এক লাইনও ছাপা হবে না। আমার কি তা আছে?

তা ঠিক। তবুও লিখে রাখুন।

মরার পরে ছাপা হবে বলে? হা-হা করে হেসে উঠলো রুদ্র।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে রুদ্রর চোখে তাকালো ইরা। রুদ্র বলল, যেভাবে তাকালেন ভয় পেয়েছি। মনে হচ্ছে ভুল কিছু বলেছি?

না। ভুল বলেন নি।

তাহলে লেখা উচিৎ। আমি লিখতে জানি না। এই ক্ষমতা দিয়ে সবাইকে পৃথিবীকে পাঠাননি বিধতা।

আপনাকে তো দিয়েছেন। না হলে প্রবন্ধ লিখেন কি করে।

সে তেমন কিছু নয়। সামাজিক দৈন্যতা দেখে মাঝে-মাঝে দু-এক পৃষ্ঠা লিখছি।

লেখাটা চালিয়ে যাওয়া উচিৎ। মানুষের জন্য। আমরা নিজেরাই ছেপে মানুষের হাতে পৌঁছে দেব।

এই কাজটিও করা দরকার।

পরের মিটিং-এ তুলে ধরতে হবে ব্যাপারটা। এবার কবিতা শুনবো।

একটু ভেবে রুদ্র বলল, এসটি কোলরিজের বিষাদগীতি শুনবো?

আজ বিষাদগীতি শোনাবেন কেনো?

কারণ বিষাদের অন্তরেই আনন্দ লুকায়িত।

তাহলে শুনি। পুরোটা শোনাবেন?

অনেকে বড় কবিতা, মাঝ থেকে একটু শোনাই।

ঠিক আছে।

কবিতার তিন আর চার প্যারা থেকে আবৃত্তি করতে লাগলো রুদ্র।

আমি আর করি না প্রশান্তি অনুভব
আর এগুলো কিইবা উপকারে আসে
আমার বুক থেকে বোঝা সারাতে?
এ হচ্ছে এক ব্যর্থ অভিযান
যদিও আমি এখনো তাকিয়ে আছি সে দিকে
সেই আলোর দিকে যা এখনো পশ্চিমাকাশে বিরাজমান,
আমি কোনো কিছু পাওয়ার আশা করি না বাহির থেকে
অনুপ্রাণিত করতে
আবেগের প্রবল্য বা জীবন,
সকল সজীবতার ঝর্ণাধারা নিজের মধ্যেই বহমান।

ও প্রিয়া! আমরা গ্রহণ করি কিন্তু আমরা কি দেই
আমাদের জীবনেই প্রকৃতিকে করে জীবিত
আমরাই তার গায়ে আরোপ করি বিয়ের পোশাক

www.banglainternet.com

আমরাই তাকে পরাই কফিন!
আর যদি আমরা কিছু দেখতে চাই উঁচু মানের,
নির্জীব শীতল পৃথিবী থেকে
যা প্রকাশিত হয় দরিদ্র, ভালোবাসাহীন, চিন্তাক্লিষ্ট জনগণের কাছে।
আহ্! আত্মা নিজেই উদগত সব কিছুকে করে আলোকিত, উজ্জ্বল।
আত্মার আবির্ভাবের মিষ্টি এবং শক্তিশালী কণ্ঠস্বর
এ স্বর হচ্ছে সবচেয়ে মিষ্টি কণ্ঠস্বর, এ হচ্ছে জীবন আর জীবনের উপাদান!

কবিতার সৌন্দর্যে কোথায় যেন হারিয়ে গেল ইরা। যেন প্রকৃতির উদারতা আর অদ্ভুত এক সরলতায় অদেখা এক সুখ প্রবাহমান স্রোতের স্বচ্ছ জলধারায় সন্তরণ। উদাস পবিত্র কণ্ঠে ইরা বলল, পৃথিবী যে এতো সুন্দর এর আগে মনে হয়নি কখনো।

ইরার দিকে তাকালো রুদ্র। বলল, আমাদের অন্তর মাঝেই সব সুখ-দুঃখ লুকিয়ে থাকে। যেভাবে আমরা গ্রহণ করি। কোনো কোনো দিন তিক্ত মনে সকালটা যেন তিক্ত মনে হয়, আবার কোনো কোনো দিন সকালটাকে মনে হয় সুখের মোহনা। অন্তরে সুন্দরকে ধারণা করার মধ্যে অসীম সুখ আছে। যা আমরা বুঝতে পারি না। তাই আমরা ভ্রান্তপথে ছুটতে থাকি সারা জীবন। আর আগন্তুকরাও এগিয়ে যেতে থাকে আমাদের পথ ধরে।

ইরা শুনলো রুদ্রর কথা। তার পর একটু ভেবে বলল, আপনার কথাগুলোই যেন সাহিত্য। সুন্দরের পথে চলার প্রেরণা। একটি কথা বলবো রুদ্র।

অনুমতি নিতে হবে না। বলে ফেলুন।

বস্তিটি ছাড়া উচিৎ আপনার।

কেনো, নির্দিষ্ট কোনো কারণ কি আছে?

আবশ্যই আছে। ঐ বস্তিতে আপনার বিপদ হবে।

কি রকম। আপনি কালাদের সাথে মিশতেন না। আপনাকে দলে নিতে চাচ্ছে। তাছাড়া পুলিশের সাথে একটি ঝামেলা হয়েছে। মাঝে-মাঝেই কালা, বিলু ওদের পুলিশি ঝামেলা হয়। এক সময় আপনি ওদের সাথে ছিলেন, সেই সূত্র ধরে পুলিশ বা অন্য কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারে।

বিষয়টি যে আমিও ভাবছি না তা নয়। কিন্তু এখনি তো আসতে পারিছ না। সবকিছুর পরেও আমার আর্থিক সামর্থ থাকতে হবে। তাছাড়া কেমন

একটি মায়াও জড়িয়ে গেছে ঘুন্টিঘরে। মনে হয় এর চেয়ে আপন ভূমি আর নেই।

বুঝতে পারছি। তবুও বাস্তবতা মেনে নিতেই হবে।

অনেকে কিছুই তো মেনে নিচ্ছি ইরা। এই দেখুন না, মাঝে-মাঝে মনে হয় আমাদের ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয়। এক সাথে কাজ করা যেতে পারে।

কেনো ব্যক্তিগত সম্পর্ক থাকা উচিৎ নয়?

আমাদের মধ্যে সামাজিক ব্যবধান অনেক। আর সমাজ আমরা অস্বীকার করতে পারি না।

অবশ্যই সমাজকে অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু সমাজ মানুষের হাতেই গড়া। আমরা তো অন্যরকম একটি সামজের স্বপ্ন দেখি তাই না রুদ্র। যেখানে মানুষের মূল্যায়ন হবে তার কর্মে। আপনি যদি কালাদের মতো হয়ে পড়ে থাকতেন তাহলে নিশ্চই আপনার সাথে কোনো সম্পর্ক গড়ে উঠতো না আমার। আবার আপনি যদি ধনী বাবার সন্তান হয়ে বখে যেতেন তাহলেও হতো না। আপনার সাথে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠেছে কারণ আমরা একই ভাবনার মানুষ।

রুদ্র তাকিয়ে রইল ইরার চোখে। এ যেন শুধুই চোখ নয়। অন্তরের পরিব্যাপ্তি আলোর মতো জড়িয়ে আছে চোখে মুখে। দু'টি নক্ষত্র, নির্ভীক প্রহরীর মতো জেগে আছে আকাশে। মেঘ আর দুর্দমনীয় ঝঞ্ঝাও যেন ম্লান করে দিতে পারবে না নক্ষত্রের মঙ্গল আলো।

সূর্যের তেজ বাড়ছে ধীরে-ধীরে। বাক্যহীন ওরা উঠলো এক সাথে। পাশাপাশি হাঁটছে দু'জন। যেন ঋণের দায়ে বাঁধা দু'জন মানুষ। কে কার কাছে ঋণী বোঝা যাচ্ছে না। মনে হয়, দু'জনেই দুজনের কাছে। নয়তো পৃথিবীর কাছে ঋণে এক সাথে বাঁধা পড়ে আছে। ঐশ্বর্য বা বিলাসিতার স্বপ্ন নেই চোখে। সম্মুখে নতুন দিনের প্রত্যাশা।

শাহবাগ মোড়ে এসে দু'জন বিদায় নিল দু'দিকে। পুরো ঢাকাজুড়ে আজ আন্দোলন হচ্ছে তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির। কিছু ভালো মানুষ রাস্তায় নেমেছে দেশের জন্য। কিন্তু দাঙ্গা পুলিশগুলো তাদের দাঁড়াতে দিচ্ছে না। মাঝে-মাঝে খুব অবাক লাগে। পুলিশ কেন এতোটা উগ্র হবে। দেশটা কি তাদের নয়। দেশের স্বার্থে যারা কথা বলবে তাদের মারবে কেন সরকারে কথা মতো। তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির দাবি যৌক্তিক। দেশে পঞ্চাশ বছরে গ্যাস রিজার্ভ

www.banglainternet.com

রেখে বিদেশিদের কাছে গ্যাস বিক্রি করা। আর গ্যাস উত্তোলনে বিদেশি কোম্পানিগুলোর সাথে যে কোনো যুক্তি জনসম্মুখে প্রকাশ। কিন্তু পুলিশ কত নির্মমভাবে ছেলেদের পিটিয়ে রক্তাক্ত করছে। পুলিশের আচরণে মনে হচ্ছে, তারা বুঝি এই দেশের জনগণ নয়। সরকার তাদের কিনে এনেছে ভিনদেশ থেকে। যা বলছে, তাই শুনবে তারা। দেশের ভালো-মন্দ কি তারা দেখবে না। দেশের শত্রুদের সাথে তাদের খুব বন্ধুত্ব, আর দেশের যারা ভালো চায় তাদের সাথে পুলিশের যেন চির শত্রুতা।

বাম দলগুলোর মধ্যে কেউ-কেউ সমর্থন করছে তাদের। এদেশে বাম দলগুলো নেড়াগাছের মতো। কেন যেন ফ্রেমের মধ্যে আটকে গেছে তারা। আগাতে পারছে না। কিসের যেন অভাব। সত্যিকারের আদর্শ নাকি সংগঠনিক দুর্বলতা? বিএনপি সমর্থন করেছে তেল-গ্যাস রক্ষা কমিটির আন্দোলন। এটা পলিটিক্যাল। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে আওয়ামী লীগও সমর্থন করতো এদের।

দুপুরের খাবার খেয়ে ব্যস্ত হলো রুদ্র। বস্তিতে এক কাণ্ড ঘটে গেছে দশটা-এগারোটার দিকে। মীর হাজীরবাগ থেকে একদল মাস্তান এসে বোমা ফাটিয়ে গেছে ঘুণ্টিঘরে। হুমকি দিয়ে গেছে, কালাকে না পেলে পুরো বস্তি জ্বলিয়ে দিয়ে যাবে। তখন বস্তিতে ছিল না কালা। এসে হৈ চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। বিলু নাকি ওদের সাথে আছে। কালা খুব ক্ষেপেছে বিলুর উপর। মালপত্র আর পোলাপান সব এক করতে নেমেছে কালা। সম্রাটও আছে কালার সাথে। বুলেট, অমল, নুরু, শিমুল ওরাও প্রস্তুত। যা হয় হবে এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

ওদের কথা শুনছে রুদ্র। বুলেট বলল, গুরু একটা কিছু করতেই হইবো। নিজেগো মধ্যে এইগুলা হইলে তো মরতে বি হইবো। ঐ শালা দুলু বি আমাগো ছারবো না।

ক্ষেপে ওঠে কালা, ঐ হালার ভয়ে ইন্দুরের গদে পলামু নি হি। তারপর কোমর থেকে চকচকে অস্ত্রটি বের করে বলল, বাগে পাইলে হালারে শেষ কইরা দিমু না। এতো ভয় পাইস না। মালের ব্যবস্থা হইয়া যাইবো। সবাইরে মাল দিমু। তার পর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বলল, গুরু বিলু হালায় বি ঘুড়ু করতাছে। ওরে তুমি কিছু কইবা না কি আমি ...।

ভ্রুকুটি করলো রুদ্র। বিলু কেন ওদের সাথে যাবে?

তুমি তো গুরু অনেক দিন আমগো লগে নাইক্কা। ঐ হালা ভাগ লইয়া আমার লগে ক্যাচাল করছে। এহন দুলুর লগে ব্যবসা বি করতে গেছে বিলু হালায়।

কি ব্যবসা?

আর কি করবো, ছব দুই নম্বরি।

বিলু এখন কোথায়?

নুরু বলল, বস্তিতে বি নাইক্কা।

গজগজ করছে কালা। খুবই উগ্র দেখাচ্ছিল ওকে। আবার বলল, এইসব ফিরোজ হালার কাম। দুলু হালায় তার লোক। বুঝলা না গুরু, আমি মোস্তফা ভাইর লগে গেছি, ফিরোজ হালার সহ্য বি হইতাছে না। হালার পুতে আমারে বিলা করতে চায়।

একটু ভাবল রুদ্র। ঠিকই বলেছে কালা। পুলিশ দিয়ে এখন কিছুই করতে পারছে না ফিরোজ। কারণ মোস্তফা মল্লিকের হাত আছে থানায়। তাই হয়তো বিলুকে হাতে নিয়ে দুলুদের দিয়ে সায়েস্তা করতে চাচ্ছে কালাকে। কালাকে হটাতে পারলে এই বস্তি আসবে বিলুর হাতে। তখন ফিরোজ নেতারও সুবিধা হবে।

কালা বলল, গুরু তুমি আমার লগে আছ তো?

রুদ্র ভাবতে লাগলো কি করা যায়। ধীরে-ধীরে গলির মুখে জড়ো হতে লাগলো বস্তির মানুষ। এক-একজনে এক-এক কথা। অন্য পাড়ার গুণ্ডারা এসে বোমা ফাটিয়ে গেল এর প্রতিশোধ নিতে হবে। মানুষ আহত হলো। এর কি কোনো বিচার হবে না। কালা কোথায়? চুপ করে বসে থাকবে না কি?

সবাইকে খুব উগ্র দেখাচ্ছিল। কিন্তু কিছু না বুঝেই কোনো ডিসিশন নেয়া যায় না। উঠে দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশে রুদ্র বলল, আপনারা শান্ত হন। ভেবে দেখতে হবে কি করা যায়। আমি যাবো ফিরোজ ভাইর কাছে। দেখি সে কি বিচার করে। অন্য যারা আছে তাদের কাছেও যাবো।

একজন বৃদ্ধা বলল, বাবা তুমি আমাদের আশা দেখাইছ, ছেলে পেলেদের নিয়া একটা কিছু করো। আমাদের দিনতো শেষ, ওরা কি আমাগো মতোই মরবো।

আপনারা কেউ ভয় পাবেন না। আমরা সবাই মিলেই এই সব প্রতিহত করবো। ওদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবো। আমরা এক থাকলে কেউ আমাদের ক্ষতি করতে পারবে না।

এরই মধ্যে একটি পুলিশ ভ্যান এসে থামলো গোলির মুখে। তখনও সমবেত জনতার সম্মুখে কথা বলছিল রুদ্র। কেউ কিছু বুঝে উঠার আগেই কালাকে ধরে ফেললো পুলিশ। রুদ্র দাঁড়িয়ে আছে। নুরু, শিমুল ওরা দৌড়ে পালিয়ে গেল। কিন্তু কেন পালাচ্ছে তা বুঝতে পারছে না রুদ্র। তবে কালার

www.banglainternet.com

কাছে অস্ত্র আছে। একটু ভয় পেলো রুদ্র। ভিড়ের মধ্যে থেকে চুমকি এসে রুদ্রর কানে কানে বলল, তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন, পালাও।

তখন আর পালাবার পথ নেই। তাছাড়া সে কোনো অন্যায় করেনি, পুলিশ তাকে ধরবে কেনো?

কালাকে ধরেই বেধড়ক পিটিয়ে কোমর থেকে অস্ত্র বের করে সাদা রুমালে গুঁজে নিল পুলিশ। তারপর রুদ্রর দিকে তাকিয়ে উগ্র ভঙ্গিতে একজন বলল, এই শালারে ধর, নেতামী, ভাষণ, শালারা থানায় গেলে টের পাবি।

মুহূর্তেই গুঞ্জন উঠলো সবার মধ্যে, ভালো ছেলেটাকে কেনো নেবে? রুদ্র কি করেছে? এটা কি মগের মুল্লুক না কি। অন্য পাড়ার গুণ্ডারা এসে বোমা ফাটিয়ে গেল আর পুলিশ এসে উল্টা ধরে নিয়ে যাচ্ছে এই পাড়ার ছেলেদের। দৌড়ে এলেন মা। ওকে ধরেছেন কেন?

পুলিশ বলল, আপনি কে?

আমি ওর মা।

ও গুণ্ডাদের লিডার।

আপনারা ভুল করছেন। ও লিডার হবে কেনো? আমার ছেলে পড়ালেখা করে। বস্তির মানুষগুলোর ভালো চায়। ওকে ছেড়ে দিন। মায়ের কণ্ঠে আকুতি।

ভালো চায়, না? শ্লেষ জড়ানো হাসি হাসলো পুলিশ। দেখাচ্ছি। সরে যান এখান থেকে। পুলিশের কণ্ঠে আদেশের সুর।

তবুও আনুনয় করতে লাগলো মা। চুমকি এলো সম্মুখে। বলল, রুদ্র আমাদের সবাইকে নিয়ে ভালো কিছু করতে চায়। ওকে ছেড়ে দিন।

চুমকির দিকে লোভনীয় দৃষ্টি পুলিশ অফিসারের। অপবিত্র পাপের ছাপ মুখে আর অসংযত আচরণ। চুমকির বুকের কাছে হাতের লাঠিটি ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ের বলল, সবাইকে নিয়ে কাজ করতে চায়, হুঁ, সরে যা হারামির বাচ্চারা। তারপর বিরবির করে বলল, যত সব বেশ্যার দল।

রুদ্রর মাথায় আগুন উঠলো। কালা শুধু বলল, গুরু মাতা গরম কইরো না। সব ঠিক হইয়া যাইবো। এতোক্ষণে মনে হয় লিডার খবর পাইয়া গেছে। ওরা কিচ্ছু করতে পারবো না। তুমি বহ।

কালার কথায় বিরক্ত হচ্ছিল রুদ্র। ওনাদের জন্যই আজ এই সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। আবার কোন সমস্যায় ফেলবে কে জানে। দিশেহারার মতো দৌড়ে রুদ্রর কাছে এলেন মা। চোখে জল। রুদ্র বলল, মা শক্ত হতে হবে। ওদের কাছে অনুরোধ করে নিজেকে ছোট করো না। ওরা আমার কিছুই

করতে পারবে না। শোন, আমার ডাইরিতে ইরার ফোন নাম্বার আছে, ওকে একটি ফোন করে দাও।

ভিড়ের মধ্য থেকে একজন বলে উঠলো, এইডা কেমন বিচার? আমাগো মাইরা গেল, পুলিশ হেগো না ধরাইরা আমাগো পোলাপানেগো ধইরা লইয়া যাইতাছে! দেশে কি আইন কানুন নাই।

ওমনি ধমকে উঠলো পুলিশ, কে বলল? কে কথা বলল? সব সরে যান। এখনি সরে যায়।

একটু নীরব হলো সবাই। গুঞ্জন বন্ধ হলো। মা বললেন, আপনারা কেনো ধরে নেবেন ওদের?

চুমকির বাবা হাঁপাতে-হাঁপাতে এসে দাঁড়ালো গাড়ির সামনে। তার সাথে পুরো ভিড়টা গিয়ে জড়ো হলো। না রুদ্রকে নিয়ে যেতে দেব না। ও আমাদের আশা। মুহূর্তেই লোকগুলো সব হৈ চৈ শুরু করলো। রুদ্রকে নিয়ে যেতে দেব না। অবস্থা খারাপ দেখে গাড়ি থেকে নেমে এলো পুলিশ। গালাগাল শুরু করলো, সবাই সরে যান, না হলে পিটিয়ে হাড় ভেঙে দেবো।

পুলিশগুলোকে খুব উগ্র আর কঠিন দেখাচ্ছিল। গাড়িতে বসেই রুদ্র দেখছে ঘটনা। আর চুপ করে বসে থাকা যায় না। তাহলে এই লোকগুলোকে মরতে হবে এই জালিমদের হাতে। চিৎকার করে রুদ্র বলল, আপনারা সবাই সরে যান। আমার কিচ্ছু হবে না। আমি কোনো অপরাধ করিনি। সবাই সরে যান। মা সবাইকে সরে যেতে বলেন।

মা এসে অনুরোধ করে সরিয়ে নিয়ে গেল সবাইকে। দ্রুত প্রস্থান করলো গাড়ি। এবার সবাই মিলে এক হলো। ধলু নেমে এলো দোকান থেকে, আমরা সবাই থানার সামনে যামু। এহনি যাইতে হইবো। সবাই বলল, হ থানার সামনে যামু। এখন মা যেন ওদের সবার মধ্যমণি। এতগুলো মানুষ তার ছেলের জন্য রাস্তায় নেমে এসেছে। খুশিতে বুক ভরে যাচ্ছে, আবার ভয় হচ্ছে, মিথ্যে মামলায় ছেলেটাকে ফাঁসিয়ে না দেয়। পুলিশ তো সব পারে। মনে-মনে আবার শক্ত হলেন, না পুলিশ সব পারে না, পুলিশ বিধাতা নয়। তারা পারে শুধু খারাপ করতে। ভালো কিছু করতে পারে না পুলিশ। পৃথিবীর সব পুলিশ কি এরকম, অন্যায় করতে ভালোবাসে? তাহলে পুলিশ কেনো?

ঘরে গিয়ে ইরার সেল নাম্বারটা পেলেন মা। ধলুর সেল ফোনে ইরার সাথে কথা হলো তার। ইরা বলল, আমি এখনি আসছি।

একটু পরেই বস্তিতে ঢুকলো ফিরোজ ভাই। সাথে বিলুসহ দলের কয়েকজন স্থানীয় কর্মী। বিলুকে দেখেই ক্ষেপে গেল সবাই। এই হারামির

www.banglainternet.com

বাচ্চাই সব করছে, ওরে বস্তিতে ঢুকতে দেয়াই যাইবো না। জটলার মধ্য থেকে গালাগাল করতে লাগলো বিলুকে। পরিস্থিতি বুঝে নিয়ে কয়েকজন মুরব্বিকে নিয়ে কথা বলল ফিরোজ ভাই। সকলেই শান্ত হলো। ফিরোজ ভাই বলতে লাগলেন, আমি আপনাদের সাথে আছি। আপনাদের উপর যারা অত্যাচার করেছে ওদের বিচার হবে। আমার দল কোনো সন্ত্রাসীকে প্রশ্রয় দেবে না। আমি দলের উর্ধ্বতন নেতাদের সাথে কথা বলবো, এমপি-র সাথেও কথা বলবো। আপনারা কোনো চিন্তা করবেন না। আর কালা সমাজবিরোধী, ওর কাছে অস্ত্র পেয়েছে পুলিশ তার জন্য আপনারা অস্থির হবেন না। আপনারা থানায় যেতে পারেন, কিন্তু লাভ হবে বলে মনে হয় না।

মা বললেন, রুদ্রকে কেন ধরে নিল ওরা?

রুদ্র কালার বন্ধু। তাছাড়া এক সাথে পাওয়া গেছে ওদের। কোনো পুলিশের সাথেও নাকি বেয়াদবি করেছিল রুদ্র। তারপর আমি ওকে বলে গেছি আমার সাথে থাকতে কিন্তু সে নিজের গতিতে চলে। কিছুটা ক্ষুব্ধ দেখাচ্ছি ফিরোজকে।

মা বললেন, সে তো খারাপ কিছুই করছে না। এই বস্তির মঙ্গলের জন্য কাজ করতে চায়।

এবার মাকে একটু আড়ালে ডেকে নিয়ে গেল ফিরোজ। বলল, দেখুন আপনারা তো সবই বোঝেন। এটা পুলিশের ব্যাপার। ওদের উপর ক্ষেপে কোনো লাভ নেই। অস্ত্র মামলা, নির্ঘাত সাজা হয়ে যাবে। আজকে রাতের মধ্যেই ওদের ছাড়িয়ে আনা দরকার। অনেক টাকা পয়সার ব্যাপার। না না, আপনার কোনো টাকা দিতে হবে না। সব ব্যবস্থা আমি করবো। শুধু রুদ্রর জন্য। ছেলেটি ভালো। কিন্তু আমার সাথে কাজ করতে হবে। কথাটা যেন মনে থাকে। আপনি কিন্তু কথা দিলেন।

ভয়ে যেন কুঁচকে যেতে লাগলেন মা। ফিরোজ বলল, না না ভয়ের কিছুই নেই। আমি তো আছি। আরে মানুষের জন্যই তো আমরা আছি। দেখি কি করা যায়। আমি থানায় যাচ্ছি।

তারপর সবার উদ্দেশে ফিরোজ বলল, আপনারা শান্ত থাকুন। কালা একটি সমাজবিরোধী। ওর শাস্তি হওয়া উচিৎ। কিন্তু রুদ্রকে ছাড়িয়ে আনার ব্যবস্থা করবো আমি। আমাদের সরকার অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না। আমরা মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি।

কথা শেষ করে চলে গেল ফিরোজ। এখনো আসছে না ইরা। সম্রাট বলল, হারুন চৌধুরীর কাছে ফোন করলে কেমন হয়?

সেতো বিএনপি-র।

বড় নেতা বি আছে। কাম বি হইতে পারে।

সম্রাটের ফোন দিয়েই ফোন করলো সম্রাট। রুদ্রকে চেনেন হারুন চৌধুরী। সে বলল, আমি সবই শুনেছি সম্রাট। এখন পার্টি অপজিশনে। বুঝতেই তো পারছ। পার্টি ক্ষমতায় থাকলে দু'মিনিটের কাজ ছিল। তাছাড়া সাথে অস্ত্র পেয়েছে, পার্টির সক্রিয় কর্মীও নয়। একে নিয়ে মুভ করা যাবে না। পার্টির সক্রিয় কর্মী হলে বলা যেতো ষড়যন্ত্রমূলক মামলা। তারপর একটু থেমে বলল, ঠিক আছে দেখছি কি করা যায়।

সম্রাট বুঝলো কাজ হবে না। ধামাচাপা দেবার কথা। তাছাড়া সত্যিই তো ক্ষমতায় নেই ওনারা। অস্থির হয়ে উঠলেন মা। কি করবে কিছুই বুঝতে পারছেন না। ফিরোজের কথায় তেমন ভরসা পেলেন না মা। সন্ধ্যা শেষ হয়ে রাত নেমেছে। এখন গলির মুখে জটলা করছে পুরো বস্তির মানুষ। যেন একটি ঝড় বয়ে গেছে এই বস্তির উপর দিয়ে। কারো যেন ঘুম নেই। নারী-পুরুষ সবাই এক সাথে মিছিলের মতো করে দাঁড়িয়ে আছে।

একেকজনে একেক কথা বলছেন। মায়ের চোখে জল ঝরছে। সত্যিই তো অস্ত্র মামলা হয়ে যাবে। তখন কি হবে? বুকের ভেতরটা কেঁপে-কেঁপে উঠলো মায়ের। একটি টাকাও নেই হাতে। রাতে যদি পুলিশ ওকে না ছাড়ে তাহলে মিথ্যা মামলা দিয়ে কাল কোর্টে চালান করবে। অস্ত্রের সাথে হয়তো ডাকাতির মামলাও দিয়ে দেবে। আজকাল এসব প্রায়ই ঘটছে।

বিলু এসে দাঁড়ালো। ওর মুখে অপরাধের ছাপ। মা বলল, বিলু তুমি এসব করতে গেলে কেন?

আমি কিছু করি নাই।

সম্রাট ক্ষেপে গেল, তুই শালা বেইমান। এই বস্তির লগে বেইমানি বি করছস। কালা কি ছুটবো না, তোরে খাইবো মনে রাহিস।

আব্বে, হলায় কি কইবার লাগছে, আমি বি কিছু জানি নিহি। দুলুর লগে আমার ব্যাবছা আছে। আমি কি জানি পুলিশ আইবো। আমিই তো বে নেতাদের লইয়াই আইলাম। যায়ুক গ্যা, আগে রুদ্র ছাড়া পায়ুক। তার পরে বি ছব দেহা যাইবো।

রাত দশটার দিকে এলো ইরা। সাথে আদিত্য, জয়ীতা, রানা, কল্লোল। ওদের চোখে মুখে উদ্বেগ আর উৎকণ্ঠা। তবে মনোবল অটুট। কিছু করতে পারবে না রুদ্রকে। ওরা থানা হয়ে এসেছে। সংবাদিকেদের সাথে কথা

www.banglainternet.com

হয়েছে। প্রয়োজনে তাদের সাহায্য নেবে। ওরা যদি ইচ্ছে করে রুদ্রকে ছেড়ে দেয়, ভালো। না হলে কাল কোর্টে মুভ করবে। শহরে বড় উকিলের সাথে কথা হয়ছে। কালা যদি মিথ্যে সাক্ষী না দেয় তবে কিছু হবে না রুদ্রর। থানায় মোস্তফা মল্লিককে দেখে এসেছে ওরা। সে হয়তো কালাকে ছাড়ানোর ব্যাপারে ম্যাকানিজম করছে। কালা ছাড়া পেলে রুদ্রকে ওরা আটকে রাখতে পারবে না। আজকের রাতটা অপেক্ষা করতেই হবে। কাল সকালে দেখা যাক কি হয়। তবে বস্তির সবাইকে এক থাকতে হবে। সংবাদিক এলে বা কোর্টে সাক্ষী দিতে হলে সত্য কথাটাই বলতে হবে। কেউ যেন ভয় না পায়।

সবাই বলল, না না কেউ ভয় পাবে না। রুদ্র সবার। যেভাবেই হোক মুক্ত করতে হবে তাকে।

মায়ের চোখে জল আসে। তার ছেলের জন্য এতোগুলো মানুষ রাস্তায় নেমে এসেছে। কত ভালোবাসে ওরা। রাত এগারোটার দিকে বিদায় নিল ইরা, আদিত্য ওরা। যে যার ঘরে চলে গেলে। চুমকি বলল, আমি আপনের লাগে যাই চাচি।

নিষেধ করলেন মা। না, একাই থাকতে পারবো। তোর বাবার অবস্থা ভালো নয়। তার কাছে গিয়ে থাক।

ঘরে ঢুকে যেন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে এলো মায়ের। আজ যেন বড় একা লাগছে। এই জগৎ-এ যেন সবচেয়ে একা একজন মানুষ সে। বুকের ভিতর ছোপ-ছোপ কষ্টের দাগ আর চোখের সম্মুখে গাঢ় এক অন্ধকার। এ যেন পৃথিবীর আদি থেকে ভেসে আসা অজস্র আদিবাসীর কান্না। এ যে অন্তিম অভিশাপ পৃথিবীর পথে। এখনো শেষ হয়ে যায়নি, সেই রোম আর গ্রীকের দাসদের হাহাকার, শেষ হয়ে যায়নি জুলিয়াস সিজারের অমানুষিক অত্যাচার আর মানুষকে গ্লাডিয়েটর সাজিয়ে মরণ খেলা।

৭

ফজরের আজান হচ্ছে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়েই আজানের সুমধুর ধ্বনি শুনছেন মরিয়ম বেগম। শরীর যেন টেনে তুলতে পারছে না বিছানা থেকে। রাতের কিছুই খাওয়া হয়নি তার। ক্ষুধা, তৃষ্ণা আর বিষণ্ন মনের হাহাকারে তিক্ত আর অসহ্য লাগছে পৃথিবী। এতো অবিচারের মধ্যে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়া অনেক ভালো। এতোকাল এই পৃথিবীতে বিচরণ, তবুও যেন চেনা হলো না কুৎসিত মানুষগুলো রূপ।

আজান শেষ হতেই বাইরে থেকে একটি ডাক ভেসে এলো মরিয়ম বেগমের কানে, মা। তখনো অপ্রকৃতিস্থ ঘোরলাগা চারপাশে। ধাতস্থ হতে চেষ্টা করলেন মা। রুদ্র এলো ...? কিন্তু কিভাবে। আবার ভেসে এলো, মা কি ঘুমিয়েছ?

বাতাসের বেগে বিছানা থেকে নেমে দরজা খুলে দিলেন মা। মুহূর্তেই মনের সবটুকু অবসাদ যেন হারিয়ে গেছে কোথায়। রুদ্রকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। তারপর শত প্রশ্ন, তুই এলি কি করে? কে তোকে ছাড়িয়ে আনলো? ওরা তোকে মারেনি তো? তুই তো ভালো আছিস... আরো কত সব প্রশ্ন। জামা তুলে পিঠ দেখছেন, পিটালে দাগ লেগে থাকবে।

শিশুর মতো মায়ের এতোসব প্রশ্ন শুনে হাসতে লাগলো রুদ্র। তারপর বলল, তুমি এতোসব প্রশ্ন করছ আমি তো উত্তরই দিতে পারবো না।

রুদ্রর মুখের দিকে তাকালেন মা। ক্লান্ত আর ক্লিষ্ট কালো মুখ। মা বললেন, হে রে কালাকে কি ছেড়েছে ওরা।

ছেড়েছে। ওর জন্যই আমি ছাড়া পেয়েছি।

উৎকণ্ঠিত হয়ে মা বললেন, সব শুনবো। আগে চল, পান্তা-পানি যা আছে খেয়ে নিবি।

মায়ের মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে মলিন মুখে রুদ্র বলল, তুমি এতো ভেঙে পড়লে কি করে চলবে মা। নিশ্চই গত রাতে কিছুই খাওনি তুমি।

www.banglainternet.com

এটা তো ঠিক নয়। আমার তো কতকিছুই হতে পারে। আবার পুলিশের হাতে ধরা খেতে পারি। জেলে যেতে পারি, তাই বলে তুমি কি না খেয়ে থাকবে।

তুই ছাড়া কে আছে বলতো আমার।

তুমি ছাড়া আমারও কেউ নেই মা। তার পর একটু থেমে রুদ্র বলল, পৃথিবীতে বহু মানুষ একা। তবুও তো এখন পর্যন্ত আমরা দু'জন দু'জনের রয়েছি।

একটু ভেবে মা বললেন, ইরাকে খবর বলেছিস?

বলেছি। কালার ফোন থেকে। সকালেই হয়তো চলে আসবে। আদিত্য ভাই আর হুমায়ুন ডাক্তারের সাথেও কথা হয়েছে।

কত বড় ঘরের মেয়ে তবুও কত ভালো। এই বস্তিতে আসে। কত সুন্দর করে মা বলে ডাকে। কি যে মায়া ওর কণ্ঠে, যেন নিজের পেটের মেয়ে।

বলতে-বললে একটি স্বপ্ন যেন ভেসে ওঠে মায়ের দু'চোখে। রুদ্র বলল, এতোটা আপন ভেবো না। কষ্ট পাবে। ভুলে গেলে চলবে না, ইরা আর আমাদের মধ্যেকার সামাজিক ব্যবধান।

মা যেন অবুঝ। কষ্ট পেলে পেলাম। তবুও ওকে পর ভাবতে যাবো কোন দুঃখে।

আর কিছু বলে না রুদ্র। ইরাকে যে কেউ ভালোবাসবে। ওর ভদ্রতা আর নমনীয়তাই ওর বড় অর্জন। দু'জন খেতে বসলো এক সাথে। হাঁড়ির তলানিতে পড়ে আছে অল্প কিছু ভাত আর খানিকটা বাসি ডাল। দু'থালাতে বড়ই বেমানান। তাই একটি থালাতেই খেতে বসলো মা-ছেলে। সাথে সামান্য পিঁয়াজ কুচি, যেন অমৃত।

খাওয়া শেষ করে রুদ্র বলল, প্রয়োজনের তুলনায় যদি সরবরাহ কম হয় তাহলে সবকিছুইর মূল্য বেড়ে যায় এবং কদর থাকে।

কেনো, এ কথা কেনো? মায়ের কণ্ঠে প্রশ্ন।

আমাদের কথাই ধরো না, যদি হাঁড়ি ভরা ভাত থাকতো তাহলে হয়তো এইটুকু ভাত এতো মজা করে খেতাম না আমরা। সব ব্যাপারেই এমনটি ঘটে।

মা বলল, তোর বলার উদ্দেশ্য কি শুধু তাই?

না। আমি অনেকে বড়-বড় পরিবারে মিশেছি। ওদেরকে দেখেছি। কিভাবে অপচয় করে ওরা। ওদের একদিনের অপচয়ের টাকা এখানকার একটি পরিবারের এক মাসের খরচ। তার পরেও ওদের মধ্যে যেন কোনো রকম বন্ধন নেই। যে যার মতো চলেছে। ছেলে যেমন মায়ের খবর নিচ্ছে না,

তেমনি মাও ছেলের। বাবা এবং মেয়ে ঠিক একই রকম।

মাথা নাড়েন মা। তারপর বলেন, তুই কি ঘুমাবি।

না। চলো নামাজ পড়ি।

অজু করে নামাজ পড়ে নিল দু'জন। নামাজ শেষ করে কুরআন নিয়ে বসলেন মা। রুদ্র ঘুমাবে না। একটু পরেই হয়তো ইরা আসবে। ওদের সাথে কথা বলে তার পর ঘুমাবো। রুদ্র বলল, তুমি কি কুরআনের বাংলা অর্থসহ পড়ো না।

পড়ি।

একটু শব্দ করে পড়ো, আমি শুনবো।

আমি কি এতো ভালো পড়তে পারি নাকি। তুই পড় আমি শুনি।

না, তুমিই পড়ো।

মা বের করলো সুরা রা'দ। রা'দ শব্দের অর্থ বজ্রপাত। প্রথম আয়াত থেকে মধুময় কণ্ঠে পাঠ করতে লাগলেন মা।

দয়াময়, পরম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি।

আলিফ-লাম-মীম-রা; এগুলি কুরআনের আয়াত; যা তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা-ই সত্য; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এতে বিশ্বাস করে না।

আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যাতীত, তোমরা এটা দেখছো; অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুবর্তী করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।

তিনিই ভূতলকে বিস্তৃত করেছেন এবং ওতে পর্বত ও নদী সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেক প্রকারের ফল সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তিনি দিবসকে রাত্রি দ্বারা আচ্ছাদিত করেন; এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।

১, ২ এবং ৩ নম্বর আয়াত শেষ করে কুরআন বন্ধ করলেন মা। রুদ্রর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোর মনটা খুব অস্থির তাই না? গতকালের ঘটনা মেনে নিতে পারছিস না।

ঠিক তাই মা। একটি বিপ্লব দরকার।

www.banglainternet.com

তা তো করছিস। এই যে প্রতিবাদ করছিস সেটা কি বিপ্লব না। একটি কথা বলি?

বলো।

সব সময় আল্লাহ্‌র উপর ভরসা রাখবি। অন্যায় করবি না। আর একটি কথা, তোরা তো এতসব বই পড়ছিস, তাহলে কুরআন পড়ছিস না কেন? এটি আসমানী গ্রন্থ, যা কখনোই পরিবর্তন হবে না। যার মধ্যে জীবন চলার সব রকম নির্দেশ দেয়া আছে। সেই গ্রন্থটা কি পড়া উচিৎ নয়?

তুমি ঠিক বলেছ মা। এখন থেকে পড়বো। অবশ্যই পড়া উচিৎ।

সূর্য উঠে গেছে, ইরা এসে হাজির। বস্তির লোকজন এখনো খবর পায়নি রুদ্র আর কালার। পেলে হৈ হুল্লোড় শুরু হয়ে যেতো। মা আর ইরার সাথে কথা বলছে রুদ্র। গতকালের সব কথা। গত রাতে অনেক ভয় দেখানো হয়েছে রুদ্রকে। প্রথমে গিয়েছে ফিরোজ ভাই। সে তার সাথে কাজ করতে বলেছে। না হলে জেলে পুরেই মরতে হবে। কিন্তু কিছুতেই রাজি হয়নি রুদ্র।

তার পর এসেছে মোস্তফা মল্লিক। সে শুধু কালাকে ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে। কিন্তু কালাকে বলতে হবে এই অস্ত্র রুদ্রর কাছেই ছিল। বাকি সব পুলিশ ব্যবস্থা করবে। কিন্তু কালা রাজি হয়নি। সরাসরি বলেছে, রুদ্র খুব ভালো ছেলে। আমি তার ব্যাপারে মিথ্যা বলতে পারবো না। এতে সারা জীবন যদি জেলে পচে মরতে হয় মরব। বাইরে থেকেই কি হবে, এইসব আর ভালো লাগে না।

রুদ্রর কথা এক মনে শুনছিলেন মা আর ইরা। মায়ের চোখে বিস্ময়! কালার মতো ছেলে, সেও সত্যি কথা বলে একজন নিরপরাধকে বাঁচিয়ে দিল। নিজের কথা একটুও ভাবলো না। আসলে সব মানুষের মধ্যে হয়তো পবিত্র সত্তা থাকে। কখনো লুপ্ত আবার কখনো প্রকাশিত। মানুষের উচিৎ মানুষের ভেতরটায় বোধ জাগিয়ে তোলা। কালাকে কত কি গালাগাল করেছে, এখন যেন তার জন্য অনুতপ্ত হচ্ছেন মা।

রুদ্র বলল, কালাকে ছাড়াতেই হবে মোস্তফা মল্লিককে। কারণ সকলেই জানে কালা তার লোক এবং এই অস্ত্রও সে কালাকে দিয়েছে। সেই কারণে থানায় অনেক টাকা ঢালতে হলো তার। কালা যখন বেরিয়ে গেল তখন বাধ্য হয়েই পুলিশ ছেড়ে দিল রুদ্রকে।

ইরা বলল, যাই হোক, আপনি ছাড়া পেয়েছেন এটাই বড় কথা।

না ইরা। এটা কোনো কথা হলো না। আপনি ভেবেছেন কতটা দুর্নীতি হয়েছে? কালার কাছে অস্ত্র পেয়েছে, তবুও কালাকে ছেড়ে দেওয়া হলো।

কিন্তু কালা আপনাকে বাঁচিয়েছে।

আপনি ভুলে যাচ্ছেন ইরা আমি নির্দোষ ছিলাম। যদি আইনের শাসন থাকতো তাহলে কালার যেমন শাস্তি হতো, তেমনি কোনো রকম হয়রানির মধ্যে পড়তে হতো না আমাকে।

আপনার কথা ঠিক। কিন্তু একদিনেই তো আপনি কিংবা আমি কেউ চলতে পারবো না স্রোতের উল্টো দিকে।

একদিনে হয়তো পারবো না, কিন্তু অসম্ভব বলে কোনো কথা নেই। সমাজিক এই অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে আমাদের জেগে উঠতেই হবে, মানুষকে জাগিয়ে তুলতে হবে।

মা নীরবে শোনেন ওদের কথা। এতোসব ভারি কথা বুঝতে পারে না মা। তবুও বুঝতে চেষ্টা করেন। কথা বলে-বলে ক্লান্ত হয়ে আসে রুদ্র। তবুও যেন বিদ্রোহের আগুন ছাড়িয়ে পড়ে ওর চোখে মুখে।

ইরা বলে আপনাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। আপনি ঘুমিয়ে নিন। বিকেলে দেখা হচ্ছে আদিত্য ভাইয়ের বাসায়।

বেরিয়ে গেল ইরা। মা চলে গেলে নিজের কাজে। আজ কি রান্না হবে তাই ভাবছেন তিনি। তেমন কিছুই নেই ঘরে। ধলুর দোকান থেকে আলু আর ডাল আনিয়ে নিতে হবে। চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখলো রুদ্র। হৃদয়ে যে উপচেপড়া অনুরাগ। কার উপর এতো অনুরাগ, স্রষ্টা না কি সৃষ্টির উপর? কিছুই যেন বুঝতে পারছে না সে। এ যেন নিশিথের শ্রাবণ ধারা। গন্তব্যহীন পায়ের গতি। তবুও যেন মুত্যুর কাছে জীবনের সকল নিবেদন।

দুপুরের পর থেকে কালা আর রুদ্রকে নিয়ে শুরু হলো বিশাল কাণ্ড। বস্তির সব লোক জড়ো হলো। চুমকি এসে বসে আছে মায়ের পাশে। কালা আর রুদ্র যেন বিশাল ক্ষমতাধর মানুষ। অস্ত্র নিয়ে ধরা পড়েও এক রাতের মধ্যে ছুটে এলো। ওদেরকে আটকে রাখতে পারেনি পুলিশ। ফাঁক বুঝে গৌরবভরা কণ্ঠে নানা কথা বলে যাচ্ছে কালা। পুলিশ ওর পায়ের নিচ দিয়ে যায় আর আসে। কালার দাম বেড়ে গেছে শতগুণ। সম্রাট এসে গুরু-গুরু করছে পায়েল কাছে বসে।

কালার নেতার অনেক ক্ষমতা। তাই কালারও ক্ষমতা বেড়ে গেছে। রুদ্র বলে অন্য কথা। গত রাতেই অনেক কথা হয়েছে কালার সাথে। বস্তির সবাইকে কাজে লাগাতে হবে। কালা আসার খবর পেয়েই বস্তি ছেড়েছে বিলু। তাই নেশার আড্ডাটা আর হবে না বস্তিতে। তবে মদের দোকানটাও বন্ধ করতে হবে। সম্রাটকে বলতে হবে। শুনলে শুনবে, না হলে ভেঙে দিতে হবে

www.banglainternet.com

বস্তির সবাইকে সাথে নিয়ে।

কালা এখন জড়িয়ে গেছে অনেক কাজের সাথে। তাছাড়া মোস্তফা মল্লিক তার পিছনে এতোগুলো টাকা খরচ করলো, সেই টাকা কালাকে দিয়েই সে তুলে নেবে। তাই এসব কাজে রুদ্রকেই এগিয়ে যেতে হবে। কালা থাকবে তার সাথে। তবে সরাসরি নয়। এ জীবন তারও ভালো লাগে না। যদি বস্তির অন্য সব মানুষগুলো ভালোভাবে বাঁচতে পারে তাহলে কালাও খুশি হবে। এই বস্তির জন্য তারও খুব খারাপ লাগে। তবে তার মাথায় এতে বুদ্ধি নেই। তাই রুদ্রকে বলে, তুমি কাম করো গুরু। আমি আছি। জীবন দিয়া থাকমু তোমার লগে। এই জীবন আর ভালো লাগে না। চোখে জল আসে কালার। রুদ্ধ হয়ে যায় কণ্ঠ।

বিকেলে আদিত্যদের বাসায় আসে রুদ্র। ডিস্টিলারি রোডের এই জায়গাটা যেন মহাব্যস্ত সব সময়। এখনো হয়তো আসেনি কেউ। একটু আগেই চলে এসেছে রুদ্র। কিসের টানে আসা হিসাব কষতে লাগলো সে। তারপর ভেতরে না ঢুকে বসল পাশের চায়ের দোকানে। এক কাপ চা নিয়ে তাকিয়ে রইল রাস্তার দিকে। রিকশা আর ঠেলাগাড়ি ঠেলা মানুষগুলোর ঘাম যেন রক্তের ফোটা। ছাই বর্ণ মুখ আর কঙ্কালসার দেহ। জীবন যেন মহাকষ্ট আর দুঃসহ বেদনায় ঢাকা।

রুদ্রর মনে হলো, কোনো বিবেকবান সভ্য মানুষের রিকশায় উঠতে কষ্ট হওয়া উচিৎ। যেন ঘাড়ের উপর দু'তিন মানুষকে বয়ে চলেছে একজন রুগ্ন অসহায় মানুষ। অনিশ্চিত পথে চলেছে এই বোঝা কাঁধে নিয়ে। যতদিন শরীরে শক্তি রয়েছে ততদিন সে বয়ে বেড়াবে, তার পর? বিধতার দিকে তাকিয়ে থাকা, কখনো কারো দয়ায় একপেটা, আধপেটা, অভুক্ত মুখে রক্ত তুলে মৃত্যু। এই তো জীবনের ইতিবৃত্ত। এর নাম কি জীবন! মুখে বিদ্রুপের হাসি ফুটে থাকে রুদ্রর।

একটি গাড়ি এসে থামলো দোকানের সম্মুখে। গাড়ি থেকে নমালো ইরা। ড্রাইভারকে বিদায় দিয়ে এসে বসলো রুদ্রর পাশে। চা খাওয়াবেন?

হাসলো রুদ্র। একটি চা দিন তো ভাই।

ইরা বলল, লেবু চা। তারপর বলল, আপনাকে অনেকটা সুস্থ দেখাচ্ছে।

সকাল থেকে দুপুর অবধি ঘুমিয়েছি। চলুন ভেতরে যাই।

আর একটু বসি। এখনো হয়তো আসেনি ওরা। একটু আগেই চলে এসেছি আমরা।

রুদ্র যেন খুঁজে পেলো তার আগে আসার কারণ। দোকানঅলা ছাড়া অন্য

কোনো লোক নেই এখানে। দু-একজন কাস্টমার যাও আসছে, দাঁড়িয়ে থেকে সদায় নিয়ে চলে যাচ্ছে। ইরা বলল, কি ভাবলেন?

কোন ব্যাপারে?

বাসাটা বদলানোর ব্যাপারে।

হেরে যেতে বলছেন?

ওভাবে দেখছেন কেন?

যে কোনোভাবেই দেখি ইরা। ঘুরে-ফিরে ঐ একই কথা হলো। আগুন দেখে তা থেকে দূরে সরে গিয়ে লাভ কি। তাতে হয়তো পুরো শহর জ্বলে যাবে ধীরে-ধীরে? তার চেয়ে আগুনের কাছে দাঁড়িয়ে যদি নির্বাপণের ব্যবস্থা করা যায়...।

আমি তো আপনাকে ওদের ছেড়ে আসতে বলছি না। শুধু নিজের কথা ভাবতে বলছি না।

পূর্ণ দৃষ্টিতে ইরার দিকে তাকালো রুদ্র। তারপর বলল, আমি ওখানেই থাকতে চাই। মানুষগুলো অনেকটাই নির্ভর করছে আমার উপর। ওদের ফেলে একা চলে আসতে পারবো না। এতে ওরা গতি হারাবে।

এরই মধ্যে এলো মিরা আর কল্লোল। জিন্স প্যান্ট আর খদ্দর পাঞ্জাবী পড়েছে মিরা। হাতে এক গাদা বই। রুদ্রর পাশে দাঁড়িয়ে বলল, চল ভিতরে চল। কি রে ইরা তোর খবর কি? ওরা এসেছে?

এখনো আসেনি।

এখনো তো কাউকে দেখছি না।

কল্লোল বলল, আমরা ভেতরে গিয়ে বসি।

ওরা ভেতরে গিয়ে বসলো। ধীরে-ধীরে চলে এলো সবাই। শাহাদাত, হারুন আর জয়ীতা এলো এক সাথে। হুমায়ূন ডাক্তার এলো সাথে দু'জন মধ্যে বয়সী মানুষ। চোখেমুখে গভীর জ্ঞানের ছাপ। রেজাউল করিম স্যার এলো, সাথে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন শিক্ষক।

সবার চোখ রুদ্রর দিকে। রেজাউল স্যার এসে জড়িয়ে ধরলেন রুদ্রকে। তারপর বললেন, কোনো ভয় করবে না। আমরা এতোগুলো লোক আছি তোমার সাথে।

হাসল রুদ্র। আমি ভয় করি না স্যার।

সে বিশ্বাস তোমার উপর আছে।

কল্লোল বলল, ঠিক ভয় নয়, তবে আরো বেশি সচেতন হতে হবে আমাদের।

www.banglainternet.com

আদিত্য বলল, একেবারেই ঠিক বলেছে কল্লোল। যেহেতু আমাদের কার্যক্রম কোনো দলীয় কার্যক্রম নয়, সেহেতু পুলিশ অবশ্যই পিছু নিবে আমাদের। শহরে টিকটিকির তো অভাব নেই।

একটু ভাবলো রেজাউল স্যার। তারপর বলল, যে কোনো ভালো কাজের পিছনে বাধা থাকবে। তাই অবশ্যই আমাদের সচেতন হতে হবে। আপাতত আমরা কোনো সামাজিক সংগঠন গড়তে পারি। এতে মানুষের সাড়া পেলে অবশ্যই কোনো রাজনৈতিক দল করা যেতে পারে। তার আগে আমাদের আদর্শগত দিকগুলো মানুষের কাছে তুলে ধরতে হবে।

আদিত্য বলল, বাম দলগুলোর সাপোর্ট পেতে পারি আমরা।

রুদ্র বলল, এদেশে বাম দলগুলো নামেমাত্র চলছে। দু'চারজন বড় নেতা দিয়ে কোনো দল চলতে পারে না। তাছাড়া তারা তাদের আদর্শ নিয়ে মানুষের কাছে পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে পুরোপুরিভাবে। না হলে বাম দলগুলো এতোটা নিষ্ক্রিয় হবে কেন। তাদের কোনো কার্যক্রম নেই বললেই চলে। তৃণমূল পর্যায়ে একেবারেই কার্যক্রম নেই তাদের। তাছাড়া বাম দলে দু'জন নেতা মহাজোটের সাথে গিয়ে তাদের মতোই হতে চলেছে। ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য তারা প্রতিবাদ করছে না মহাজোটের গণবিরোধী কার্যক্রমের।

মিরা বলল, তবুও তো ওরা অন্য দলের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন।

রুদ্র বলল, হতে পারে। কিন্তু ক্ষমতা পেলে তাদের রূপ পরিবর্তন হয়। তখন তাদের আদর্শ স্তিমিত হয়ে পড়ে। এর বড় প্রমাণ মহাজোটের সাথে যোগ দেয়া। বিএনপি আর আওয়ামী লীগের মধ্যে আদর্শগত কোনো পার্থক্য নেই। দু'দল চরম অগণতান্ত্রিক, নেত্রী-পূজা ছাড়া আর কিছুই চলে না সেখানে। তারা পুঁজিতন্ত্রে বিশ্বাস করে এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় অন্য দলের বদনাম করে। নিজেরা কাজ করে এগিয়ে যেতে চায় না।

আদিত্য বলল, আমাদের কাজ হবে সাধারণ মানুষকে নিয়ে। যদি সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়ানো যায় তাহলে কোনো অশুভ শক্তিই সুবিধা করতে পারবে না।

মিরা বলল, প্রত্যেকে যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ বা প্রতিরোধে এগিয়ে আসে তাহলে সমাজে থেকে অপশক্তি হ্রাস পাবে। সে জন্য দরকার শিক্ষা।

শাহাদাত বলল, শিক্ষা নয়, সুশিক্ষা। আমাদের দেশে শিক্ষিত লোকের অভাব নেই। কিন্তু সুশিক্ষিত লোকের অভাবে দেশের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

ইরা বলল, আমাদের একটি পত্রিকা বের করা দরকার।

জয়ীতা বলল, সেটা কি অন্যান্য দৈনিক বা সাপ্তাহিকগুলোর মতোই হবে?

ইরা বলল, না। অন্যসব দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকাগুলোর মতো হবে না। সম্পূর্ণ ভিন্নধারার একটি পত্রিকা বের করতে হবে। এই মুহূর্তে তো আমাদের পক্ষে দৈনিক বের করা সম্ভব নয়। তাই সাপ্তাহিক বের করতে হবে। মানুষের মধ্যে সচেতনতা বাড়নোর জন্য একরকম প্রচার মাধ্যম হতে পারে এই পত্রিকা। আমাদের লিখতে হবে সমাজের বৈষম্যের বিরুদ্ধে। উল্লেখযোগ্য কিছু ঘটনা প্রবাহের বিশ্লেষণ। কিভাবে প্রতিনিয়ত এদেশের মানুষ নির্যাতিত হচ্ছে। তাদের নিপীড়নের উৎস তুলে ধরতে হবে।

হুমায়ুন ডাক্তার বললেন, অবশ্যই মানুষ তা গ্রহণ করবে। মানুষ আজ দিশেহারা। কি করবে বুঝতে পারছে না। মানুষ প্রস্তুত এই বন্দীদশা থেকে মুক্তি পাবার জন্য।

হুমায়ুন ডাক্তারের সাথে আসা সহিদুল ইসলাম বললেন, আমাদের অবশ্যই প্রতিরোধ গড়তে হবে। সাধারণ মানুষের প্রতিরোধ সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে। তারপর প্রশ্নের ভঙ্গিতে বললেন, কে বেশি ক্ষতি করছে দেশের? ঘুষঘোর, সুদঘোর, আড়ৎদার, মজুদদার না কি চোর, ডাকাত, ছিনতাইকারী? একজন চোর সে কখনো মানুষের সর্বস্ব এবং দেশের বড় কোনো ক্ষতি করতে পারে না। পেটের দায়ে ঘরে সিঁদ কেটে কিছু হাতিয়ে নেয়। একজন ছিনতাইকারী অস্ত্রের মুখে পকেটে যা থাকে তাই কেড়ে নেয়। কিন্তু একজন ঘুষখোর, সে শুধু একজন মানুষকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে না পুরো দেশটাকে এমনভাবে পঙ্গু করে দিচ্ছে, যার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয় পুরো জাতিকে। এদের বিরুদ্ধে মানুষ যতদিন সচেতন না হবে ততদিন, আমরা এগিয়ে যেতে পারবো না।

রুদ্র বলল, ওদের বিরুদ্ধে যদি সরকার ব্যবস্থা না নেয় তাহলে সাধারণ মানুষের কি করার আছে?

শহিদুল ইসলাম বললেন, সাধারণ মানুষই তাদের বিরুদ্ধে ভালো ব্যবস্থা নিতে পারবে।

কি করে?

খুবই সহজ। একটু লক্ষ্য করুন সবাই। আমাদের মধ্যে একটি ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে। যার কাছে টাকা আছে তাকে আমরা বেশি সম্মান করি। কারণ এদেশে বেশিরভাগ মানুষই ক্ষুধার্ত। মাঝে-মাঝে তাদের কাছ থেকে যৎসামান্য কিছু পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা বুঝতে পারি না অসৎ টাকা আমাদের কোনো কাজে লাগে না। তাদের কারণেই কোটি-কোটি টাকার

www.banglainternet.com

ক্ষতিতে পড়ছে রাষ্ট্র। কিন্তু আমরা তাদের ঘৃণা না করে তাদের যখন সম্মান করছি, তখন খারাপ কাজে উৎসাহটা বেড়ে যাচ্ছে তাদের। তারাও ভাবছে টাকাই সবকিছু। কারণ একজন ভালো মানুষ, যার কাছে টাকা নেই তাকে যখন মানুষ সম্মান করছে তখন সমাজের অসৎ মানুষগুলো খুবই উৎসাহ পেয়ে যায় অসৎ কাজে। সাধারণ মানুষের যা করার আছে সেটা হচ্ছে তাদের বয়কট করা। আমরা কিছুই যদি না করতে পারি তাদের অন্তত ত্যাগ করতে পারি। তাদের সাথে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করতে পারি, তাদের ছেলেমেয়েদের দিকে আঙ্গুল দিয়ে দেখাতে পারি– ঘুষখোরের মেয়ে। তাহলে সেই ছেলেমেয়েরাই হয়তো তাদের বাবা, মাকে বোঝাবে। না হলে তারাই এসব লোকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমে আসবে। এমন অনেক প্রমাণ রয়েছে যে, বুর্জোয়ার ছেলেমেয়ে হয়েও সব ছেড়ে রাস্তায় নেমে এসেছে মেহনতি মানুষে পক্ষে। এঙ্গেলস্ এর বড় উদাহরণ। মোট কথা, অসৎ মানুষকে সম্মান করার অর্থ তাদের কাজের উৎসাহ বাড়ানো। এটার চেয়ে অধর্ম এবং পাপে কাজ আর কিছুই হতে পারে না।

রুদ্র তাকিয়ে আছে শহিদুল ইসলামের দিকে। উনি ঠিক কথাই বলেছেন। ইরাও তো সব ভুলে কাজ করতে এসেছে মেহনতি মানুষের জন্য। রুদ্রর চোখে যেন অশনি। বলল, আপনি ঠিক কথাই বলেছেন। আমাদের সমাজের এই অচল-অবস্থা এবং অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে বিধাতাবিমুখতা। মানুষ তার পথ থেকে সরে যাচ্ছে। তার অন্তর থেকে যেমনি মরে গেছে বিধাতার ভয়, তেমনি সে হারাতে বসেছে শ্রদ্ধা, দায়িত্ববোধ এবং দায়বদ্ধতা। এই লোকগুলোই যখন চাকরি, ব্যবসা কিংবা দেশের নেতা হচ্ছে তখনই দেশের অবস্থা খারাপ হচ্ছে। আর একটি কথা হচ্ছে, যারাই অসৎ কাজ করছে বা করার চেষ্টা করছে তাদের প্রধান সমস্যা হচ্ছে উপার্জনের চেয়ে চাহিদার বিশালতা।

ইরা বলল, আপনি ঠিক বলেছেন। আমরা আমাদের অবস্থান ভুলে গিয়ে অধিক চাহিদার জন্য দুর্নীতির সাথে জাড়িয়ে পড়ছি। কিন্তু প্রশাসনের অদক্ষতা এবং দুর্বলতাকে অস্বীকার করা যাবে না। আর এর জন্য সরকার সবচেয়ে বেশি দায়ী। কারণ সরকারগুলো মনে করছে তাদের কোনো রকম দায়বদ্ধতা নেই জনগণের উপর। কারণ দু'টি দলের মধ্যে এদেশের মানুষের ভাগ্য নির্ধারিত। আমারা এই বলয় ভেদ করতে পারছি না। বরং এদেশের মানুষের দারিদ্র্যতার সুযোগ নিয়ে এদের ব্যবহার করে চলেছেন তারা। একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে অল্প পারিশ্রমিক দিয়েই যে কোনো কাজ করানো যায়। রাষ্ট্র যখন

তার দায় নিতে পারে না, তখন সে কেনো রাষ্ট্রর দায় নিতে যাবে। তাছাড়া ক্ষুধা মানুষের দায়, বোধ, সচেতনতা, ভালো-মন্দ সব ভুলিয়ে দেয়। শুধু পেটে ভাত দিতে হবে। তখন নির্দ্বিধায় সব কাজ করতে পারে সে।

আদিত্য বলল, সমাজেই এসব বৈষম্যর বিরুদ্ধে ঐক্য গড়ে তুলতে পারলে এগিয়ে যেতে পারবে মানুষ। আমরা যদি কোনো একটি জনগোষ্ঠীকে ধরে কাজ করতে পারি তাহলে তারই পরিব্যাপ্তি ছড়িয়ে পড়ছে সারা দেশজুড়ে। মানুষ এগিয়ে আসবে।

আমাদের কাজ করতে হবে তৃণমূল পর্যায়ে। যেখানে মানুষ নিষ্পেষিত, নিপীড়িত, সুবিধাবঞ্চিত এবং বৈষম্যের শিকার হচ্ছে দিনের পর দিন।

স্যার বললেন, এতে অনেক বাধা আসবে। অনেক অন্যায় অবিচার সহ্য করতে হবে। তার জন্য কি আমরা সবাই প্রস্তুত?

এক সাথে সবাই বলে উঠলো, অবশ্যই প্রস্তুত।

ইরা বলল, আমাদের পূর্ব-পুরুষেরা নির্দ্বিধায় জীবন দিয়েছেন এদেশটা স্বাধীন কারার জন্য। একাত্তরে কত রক্ত দিতে হয়েছিল। সম্ভ্রম ও জীবন দিয়ে হয়েছিল। অন্যায় সহ্য করতে হয়েছিল তাদের। তাহলে দেশটাকে সুন্দর করার জন্য আমরা কেনো পারবো না আমাদের জীবনের এই সামান্য ত্যাগ করতে। এতো দেশেরই জন্য।

রুদ্র বলল, গণজাগরণের মাধ্যমে এদেশের জনগণ একদিন ছুড়ে ফেলে দেবে এদেশের বৈষম্যভরা শাসন ব্যবস্থাকে।

স্যার বললেন, তোমাদের ঘুণ্টিঘরের অবস্থা কি রুদ্র?

খুব ভালো স্যার। ওরা কাজ করতে চায়।

তাদের নিয়েই কাজ শুরু করতে হবে আমাদের। অবশ্যই তাদের কাজ দিতে হবে। সরকারের দিকে তাকিয়ে থাকলে চলবে না। আমাদের কাজ আমাদেরকেই খুঁজে নিতে হবে।

কথা চলতে থাকে। প্রথম কাজ হলো বিদেশি পণ্য বর্জন করা। মুক্তবাজার অর্থনীতিতে ক্ষুদ্র দেশগুলো এমনভাবে ধ্বংস হতে থাকে, যেন ধীরে-ধীরে বিষ দিয়ে ধ্বংস করা হয় একজন সুস্থ মানুষকে। চীন, ভারত, রাশিয়া বা পশ্চিমা দেশগুলোর সাথে কখনোই রেস করে কুলাতে পারবে না বাংলাদের মতো গরিব দেশগুলো। ইন্ডিয়া থেকে দু'হাজারেরও বেশি পণ্য বাংলাদেশে ঢুকছে প্রতিদিন। তার বিনিময়ে মাত্র চারশ'টি বাংলাদেশী পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ইন্ডিয়ায়। তাই এসব বড় দেশগুলোর আগ্রাসনে প্রতিনিয়ত ধ্বংস হচ্ছে ক্ষুদ্র দেশগুলোর কলকারখানা। গত চল্লিশ বছরে বাংলাদেশে যা ঘটেছে

www.banglainternet.com

ভারতের আগ্রাসনে তা বাংলাদেশের মতো ক্ষুদ্র দেশের পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। ভারত বাংলাদেশকে টাকা ঋণ দিচ্ছে এই শর্তে যে, মোট ঋণের আশি ভাগ টাকার যন্ত্রপাতি কিনতে হবে তাদের দেশ থেকে এবং সুদও দিতে হবে তাদের। বিনা সুদে বা সহজ শর্তে ঋণ দিচ্ছে না তারা। তাদের দেশে আমাদের কোনো টিভি চ্যানেল নেই। অথচ তাদের টিভি চ্যানেলের ভিড়ে আমাদের দেশের টিভি চ্যানেলের বাংলা নাটক দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং সিনেমা হলগুলো প্রায় বন্ধ হবার মুখে।

দেশের এক শ্রেণীর জনগণের বিজাতি সংস্কৃতির উপর গভীর অনুরাগ আর মেরুদণ্ডহীন সরকার ব্যবস্থা এর জন্য দায়ী। একটি প্রতিবেশি দেশ আমাদের একটি চ্যানেলও চিতে চাইবে না আর আমরা পরম ভক্তির সাথে তাদের চ্যানেল দেখছি। ছি ছি!

আমাদের দেশের জনগণ এখনো এতোটা সচেতন নয়। তাই বিদেশি যে কোনোকিছুর প্রতি এখনো আমাদের ঝোঁকটা বেশি। তাই প্রথম তো মানুষকে সচেতন করতে হবে দেশি পণ্য ব্যবহারে। বিদেশি পণ্য বর্জন করতে পারলে দেশে কর্মসংস্থানও বাড়বে। ছোট-ছোট উদ্যোক্তা বেরিয়ে আসবে। মানুষের মধ্যে যখন এই দেশপ্রেম জাগ্রত হবে তখন তারা নতুন কিছু চিন্তা করতে পারবে।

বস্তির মানুষগুলোকে একসাথে করা গেলে একটি শক্তিতে রূপান্তরিত হবে। জনসমস্যা রূপান্তরিত হবে জনশক্তিতে। তাদের কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রকম কাজ করানো যাবে। পরিবারগুলো স্বচ্ছল হতে পারবে।

সেদিনের আলোচনা শেষ হলো। কাজ ভাগ করে দেয়া হলো। যে যার মতো কাজ করে যেতে হবে। সপ্তায় একদিন চলবে আলোচনা। এছাড়া জরুরি মিটিং বা কারো সাথে দরকার হলে তৎক্ষণাৎ আলোচনার সুযোগ রয়েছে। এই কাজের জন্য একটি ফান্ড গঠন করতে হবে। প্রথমে নিজেদেরই গঠন করতে হবে এই ফান্ড। যার যেরকম সাধ্য রয়েছে। এছাড়া সবাই মিলে ফান্ড গঠনে চেষ্টা করবে।

তবে বস্তি সংস্কারের কাজ পুরোটাই দেখতে হবে রুদ্রর। জনগণের সাথে ওর রিলেশনটা ভালো। তাছাড়া সে সহজেই মানুষের কাছে যেতে পারে। রুদ্রকে সাহায্য করবে সবাই।

৮

আজ চাঁদের পঞ্চদশ তিথি। আকাশের গায়ে পূর্ণ চাঁদের খেলা। নীরব নিস্তব্ধ প্রকৃতি। যেন প্রাণ ভরে চাঁদের সুধা সংগ্রহে ব্যাকুল। হেমন্তের শেষ। শীত তার আগমনী বার্তা প্রকাশে উদার। শাখায়-শাখায় পুরনো পত্রের ক্রন্দন। নতুনের আগমনে ঘটবে বৃন্ত বিচ্ছেদ। মলিন ধুলোয় চলবে মৃতপত্রের মহাউৎসব। সাদা মেঘেদের ভেলায় চড়ে মাটির প্রাণে ঘটবে জ্যোৎস্নার আগমন। যেন কুয়াশা মাখা রুপালী বৃষ্টি আর স্বার্গলোকের পবিত্র হাতছানি।

অকুণ্ঠিত বায়ু প্রবাহের পবিত্র মন্ত্রে ফুটছে সন্ধ্যামালতি। রাত পোকার দাপাদাপি আর প্রকৃতির আহ্বানে চির মীমাংসিত ঋতু প্রবাহ। যেন প্রচীন কোনো কবির যামিনী-সৌন্দর্য মুগ্ধ বর্ণনার এক বিখ্যাত চিত্র। দৃষ্টি আর অন্তরের সংমিশ্রণে গভীর প্রেম প্রবাহের উপমা। সেই আদি থেকে অনন্ত পর্যন্ত চির নতুন, চির মধুমাখা রাত আর রাতের কানে ভোমরার গুঞ্জরণে বৃন্তভ্রষ্ট ফুলের বিলাপ।

রাতের এই সৌন্দর্য যেন অপ্রকাশিত, অব্যক্ত, শুধু অনুভব আর সংবেদনায় মাখা শীতল নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে, হৃদয়ের অন্তিম পথে ঘুরে-ঘুরে প্রকৃতির মাঝে বিলিয়ে দেয়া। অজানা কোনো পথে ক্লান্ত পথিকের অগম্য পথে চলার নিবেদন। দূর ব-হু দূর হেঁটে কেনা পুরাতন ঝরনার গতি পথে চির নতুন নদী প্রবাহের আহ্বান। এ যেন মহাজাগতিক অনন্ত কালের দিবা-যামিনী খেলার অন্তরে নির্জলা প্রেমের অন্তিম অনুশোচনা আর প্রদীপের বুকে ঘন আঁধারের খেলা। যেমনি কৃষ্ণকালো মেঘেরা অশনি আলো ধরে রাখে বুকে।

টিএসসিতে বসে আছে রুদ্র। আনমনে তাকিয়ে আছে চাঁদের দিকে। সম্মুখে মন্থরিত মানুষের চলাচল। একটু পরেই হয়তো নিঝুম হবে চারপাশ। রাতের নিস্তব্ধতা সর্বগ্রাসী হয়ে ঢেকে দেবে প্রাচীন এই জনপথ।

এতক্ষণ অনেকেই ছিল এখানে। এক-এক করে সব উঠে গেছে যে যার

www.banglainternet.com

মতো। শুধু বাক্যহীন পাশে বসে আছে ইরা। যেন নিঃশ্বাসের শব্দটিও বড় বেদনাবিধুর।

আজ সারাদিন ধরে বস্তিতে কাজ করেছে ওরা। মানুষগুলোকে এক করতে পেরেছে। আসলে ক্ষুধায় সব সময় সঙ্কুচিত হয়ে থাকতো মানুষগুলো। মনের ভেতর কি যেন এক ভয়, যেন পারবে না, হবে না... মানুষের চাকর হয়ে থাকাই ভালো। সেই সব শঙ্কা ভয় সব দূর হয়ে গেছে সবার মন থেকে।

চুমকিসহ বস্তির যুবতী মেয়েরা সেলাইয়ের কাজ করবে পারুলের সাথে। এখন থেকে আর বাইরে কাপড় সেলাই করাবে না পুরো ঘুন্টিঘরের মানুষ। তাদের কাপড় এখানে তৈরি করা হবে। যাতে টাকাগুলো বাইরে চলে না যায়।

ঘুন্টিঘরের মেয়ে আর শিশুদের জামা-কাপড় সেলাই করতে পারলেই ওদের শেলাইয়ের দোকনটা কোনো রকমে চলে যাবে প্রথম অবস্থায়। বস্তিতে কম লোক নয়। তাছাড়া আশপাশে গরিব মানুষ পারুলের পুরনো কাস্টমার। এখন আরো ভালো চলবে তাই অনেকেই আসবে এখানে।

পারুলের ঘরটির পুরোটাই দোকান বানানো হবে। পারু তার মাকে নিয়ে থাকবে চুমকিদের ঘরে। একটি মেশিন থেকে তিনটি মেশিন চালানো হবে। প্রায়োজনে মেশিন বাড়ানো হবে। সবারই সাহায্য করতে হবে সবাইকে।

এই শেলাই ঘর নিয়ে বিশাল পরিকল্পনা রয়েছে। এখান থেকে পাঁচজনকে উন্নত ট্রেনিং দেয়া হবে। এই ট্রেনিং দেয়ানো হবে কোনো উন্নত প্রতিষ্ঠিত কাপড় প্রতিষ্ঠান থেকে। ওদের ট্রেনিং দেয়া হবে বিভিন্ন ডিজাইন, নকশিকাঁথা, কাপড়ের উপর বিভিন্ন রকম সুতোর কাজ, বাটিকের উপর।

এই পাঁচজন মিলে ট্রেনিং দেবে বস্তির যুবতী এবং মধ্য বয়সী কর্মস্পৃহ নারীদের। এই কাজ যখন পুরো চালু হয়ে যাবে তখন কাজে লাগানো হবে যুবকদের। তারা মার্কেট ঘুরে বিভিন্ন রকম কাজের অর্ডার সংগ্রহ করবে এবং বিক্রি করবে। তাছাড়া যে প্রতিষ্ঠান থেকে কাজের ট্রেনিং নেয়া হবে তাদের কাছ থেকে একটি সুযোগ পাওয়া যেতে যাবে। তারাও কাজ দেবে, যদি তাদের চাহিদা মতো শ্রম-মজুরি পায় তারা। শুধু মাত্র এই প্রতিষ্ঠান দিয়েই বস্তির অর্ধেক লোকের কর্মসংস্থান হতে পারে।

নুরু, শিমুল ওদের আগ্রহ বিস্মিত হবার মতো। ওরা কাজ করছে বিপুল আগ্রহ নিয়ে। ঘুন্টিঘরের প্রত্যেকটি ছেলে কাজ করবে। যে কোনো কাজ। এই সব কাজের জন্য একটি ফান্ড গঠন করা হবে। আর অর্থ সংগ্রহ হবে প্রত্যেক ঘর থেকে চাঁদা তুলে। এসব অর্থ বেটে দেয়া হবে প্রত্যেকের মধ্যে। তারা আবার সেই অর্থ ফান্ডে ফেরত দেবে একটি নির্দিষ্ট কিস্তিতে।

এখানে বসে থাকবে না কেউ। বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের কাজ হবে সহজ। তারা হাঁস-মুরগি পালন করতে পারবে। তাদের সাহায্য করবে যুবকেরা। মধ্য বয়সী পুরুষেরা করবে ব্যবসা। বস্তির আশপাশে যে সব দোকানগুলো রয়েছে অনেক দূর থেকে এসে এখানে ব্যবসা করছে তারা। এই বস্তির লোকগুলোই তাদের কাস্টমার। যদি বস্তির পক্ষ থেকে সমবায়ের ভিত্তিতে এখানে দোকান দেয়া হয় আর বস্তির সব লোক যদি সেখান থেকে পণ্য ক্রয় করে তাহলে এখানেও কাজ করতে পারবে কম হলেও পাঁচ-সাতজন।

তাদেরও পুঁজির ব্যবস্থা করবে বস্তির ফান্ড। বস্তির ফান্ড যদি অর্থায়নে ব্যর্থ হয়ে পড়ে তাহলে রুদ্রের ফান্ড থেকে অর্থায়ন করা হবে তাদের। সবাই মিলে যে কোনো শক্ত কাজ করা সম্ভব। মনোবল আর সৎ হয়ে কাজ করতে হবে সবার। এতোদিন মানুষের দাস হয়ে কষ্ট করেছে সবাই, এবার নিজের কাজে সৎ এবং সুন্দর থেকে কাজ করা।

এসব প্রত্যেকটি কাজের বিশেষ করে অর্থ সংক্রান্ত বিষয়ে হিসাব রাখবে রুদ্র আর বস্তির একজন মুরব্বি। তিনি শিক্ষিত। আর সব কাজের কঠোর মনিটরিং করানো হবে কালা, অমল, বুলেট আর সম্রাটকে দিয়ে। ওরা কাজও করবে আবার মনিটরিংও করবে। যাতে কেউ চুরি না করতে পারে এবং প্রত্যেকে যেন সময়মতো কাজ এবং কিস্তি পরিশোধ করে। মূলত ফান্ডের দায়িত্ব এবং মনিটরিং ব্যবস্থা যদি ভালো হয় তাহলেই কাজ এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। তাই রুদ্র বারবার কথা বলে নিল কালাদের সাথে। ওরা নিজেদের সুধরাতে চায়। রুদ্রর কথা মতোই চলবে তারা।

প্রত্যেক পরিবার থেকে অন্তত একজনকে কাজ দেয়া হবে। যদি আরো কেউ কাজ করার মতো থাকে তাহলে কাজ করতে পারবে। ছোট-ছোট শিশুদের স্কুলে যাওয়া বাধ্যতামূলক করতে হবে। যদি সেই শিশুর সংসারে কর্মঠ কেউ না থাকে তাহলে সমবায়ের পক্ষ থেকে তাদের ভরণপোষণ করতে হবে।

মরিয়ম বেগমের উপর ভার পড়েছে শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার। যাতে তারা স্কুলে যেতে পারে। তিনি তাদের শিক্ষা দেবেন বাংলা আর আরবি। অন্যান্য বিষয়ের জন্য আরো দু-তিনজন তাকে সাহায্য করবে। আপাতত কারো বেতন থাকবে না। তারা নিঃশর্তভাবেই এই কাজটি করবে। সমবায় যদি এগিয়ে যেতে পারে তাহলে তাদের বেতন-ভাতার ব্যবস্থা করা হবে এবং ছোট একটি স্কুল ঘরের মতো করে দেয়া হবে।

এসব কিছুই এসেছে রুদ্রর মাথা থেকে। সেটার সাথে মত দিয়েছে হারুন

www.banglainternet.com

স্যার, হুমায়ুন ডাক্তার, আদিত্য ভাই, ইরা, নয়ন, কল্লোল, মিরা ওরা। সবার মধ্যে আনন্দ। এ যেন একটি রাষ্ট্র পরিচালনার আসল রূপরেখা। প্রত্যেকটি ক্ষেত্র খুবই চমৎকার। কাজ করতে পারলে মাত্র পাঁচ বছরে মধ্যে পুরো ঘুণ্টিঘরের চেহারা বদলে দেয়া সম্ভব। তবে এক থাকতে হবে সবার।

এই কথাগুলো আদিত্য, ইরা, শাহাদাতসহ যখন ঘুণ্টিঘরের মানুষের সামনে তুলে ধরলো রুদ্র, তখন খুবই সুশৃঙ্খল মনে হচ্ছিল সবাইকে। এক বাক্যে সবাই বলে উঠলো, আমরা ভাত চাই। তোমার কথা মতোই চলবো আমরা। কেউ অন্যায়ভাবে মারতে পারবে না, আমাদের ছেলে মেয়েরাও শিক্ষিত হবে। মজিবর আর হাসেম চাচার দারুণ আগ্রহ। তারা সেই আমলের অষ্টম শ্রেণী পাস। ভাগ্যের বিড়ম্বনায় আজ বস্তিতে ঠাঁই হয়েছে তাদের। তারা বলে, যে করেই হোক এই সমবায় আমাদের টিকিয়ে রাখতেই হবে। রুদ্র তোমার সাথে আমরা আছি। যেন তখনই কাজে লেগে গেল সবাই। কাল নয় এখন থেকেই কাজ শুরু।

মলিন মুখে চাঁদের দিকে তাকিয়ে আছে ইরা। রুদ্র বলল, আজ এতো বড় একটি কাজ হলো আর আপনি মলিন মুখে বসে আছেন।

প্রকৃতিস্থ হলো ইরা। ম্লান হেসে বলল, কখনো-কখনো সুন্দর কিছু পাবার পরেও মনটা যেন কেমন বিষাদে ভরে উঠে। তবে তাতে ব্যথা থাকে না, থাকে নিবিষ্ট ভালো লাগা।

কিন্তু আপনাকে কেমন যেন অন্যরকম লাগছে।

জানেন রুদ্র, জীবনটাকে যেন অর্থহীন মনে হয়।

কেনো? কর্মে না কি জন্মে?

জন্মের জন্য।

কি হলে অর্থবহ মনে হতো?

জীবনের অর্থ কি রুদ্র? ইরার কণ্ঠে গভীর মায়া আর ভালোবাসা।

সঠিক করে বলতে পারবো না। তবে কেনো যেন মনে হয়, শুদ্ধ প্রেম, পবিত্র বন্ধন, সঠিক পথ, ত্যাগ, আর দয়ার মধ্যেই জীবন সুন্দর অর্থবহ।

কেন যেন মনে হয় এসবের কিছুই নেই আমার।

আমিতো দেখি সবই আছে আপনার।

না কিছুই নেই।

বাবা-মায়ের প্রতি রাগ?

রাগ! না।

কেনো?

যখন রাগের খোঁজ নিতে কেউ আসে না, তখন রাগ যেন দুঃসহ হয়ে পড়ে তাই। এই যে রাত করে বাসায় ফিরছি জিজ্ঞেস করার মানুষটিও নেই। বড় বন্ধনহীন মনে হয়।

সে তো ভালোই।

বন্ধনের সাথে যে ভালোবাসা জড়িত। বন্ধনহীন আর ভালোবাসাহীনের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই?

হয়তো আপনার ধারণা ভুল। সবার ভালোবাসা প্রকাশের ভঙ্গি এক রকম হয় না।

ইরা তাকায় রুদ্রর চোখে। বলে, ভালোবাসা প্রকাশ করতে হয় না। এ অনুভবের ব্যাপার।

ইরার চোখে কি এক অচেনা দৃষ্টি; কেঁপে-কেঁপে উঠে রুদ্রর সমস্ত শরীর। কথা ঘোরাতে রুদ্র বলে, আজকে চাঁদটা খুব সুন্দর তাই না?

বিরহের কথা বলে, না কি মিলনের?

প্রকৃতি বড় উদার।

আপনার মতো?

এ যে প্রহসন হয়ে গেল।

কেনো হবে?

কেনো হবে না?

এই যে আপনি নিতে নয় শুধু দিতেই যে ভালোবাসেন।

আপনি ভুল বললেন, আসলে নেবার মতো সাধ্য নেই আমার। অমূল্য কিছু নেবার জন্য পাত্র চাই। সেই পাত্র আমার নেই।

এ কি নিজেকে মূল্যহীন ভাবা, না কি নীরব প্রত্যাখ্যান?

প্রত্যাখ্যান! সারা জীবন যারা প্রত্যাখ্যাত হয়ে এসেছে, তারা করবে প্রত্যাখ্যান।

আরো যেন কি বলতে চেয়েছিল ইরা। অকস্মাৎ রুদ্র বলে উঠলো, রক্তকরবী আজ নয় ভালোবাসার দিন, ধ্বংসের মুখে আমরা।

কি যেন ভাবল ইরা। তারপর বলল, আচ্ছা আপনি আপনার বাবার কথা বলেননি কখনো।

সহজ কণ্ঠে রুদ্র বলল, আসলে বলার কিছু নেই। তাই বলা হয়নি। তার পর ব্যথিত কণ্ঠে বলতে লাগলো, লোকটি ছিল বদমেজাজি আর কঠিন হৃদয়ের। মাকে মরতো।

মায়ের কপালে একটি দাগ...

www.banglainternet.com

ওটা ওনারই উপহার।

দাগটা কিন্তু এখন আর খারাপ লাগে না মায়ের কপালে।

তা লাগবে কেন, বাঙালি নারীরা যে স্বামীকে প্রভু মনে করে। প্রভুর দেয়া আঘাত তো অলঙ্কারের মতোই। রুদ্রর কণ্ঠে ছিল বিদ্রুপ আর কষ্ট।

কাষ্টের হাসি হাসে রুদ্র। আবার বলতে লগালো, আমাদের ফেলে বাজারের নষ্ট একটি মেয়েকে নিয়ে চলে গেছে বাবা। মায়ের মতো সুন্দর চরিত্র এবং পবিত্র মনের নারী তার পছন্দ নয়! মাঝে-মাঝে যে তার কথা মনে হয় না তা নয়। তবে ইচ্ছে করেই ভুলে থাকি। মায়ের সম্মুখে তার নাম মনে করি না। কারণ এখনো মা তাকে ভালোবাসেন। মাঝে-মাঝে গভীর রাতে বাইরে গিয়ে একাই বসে থাকেন মা। দীর্ঘ নিঃশ্বাসে যেন ভারি হয় বাতাস। নীরবে অশ্রু ঝরে মায়ের চোখে। নির্বাক চেয়ে থাকেন আকাশের দিকে। মনে হয় কষ্টের বিষে ছেয়ে গেছে রক্তের প্রতিটি কণা। কিছুই করার থাকে না আমার। এই কষ্ট নির্বাপণের কোনো উপায় জানা নেই। নিজেও দগ্ধ হতে থাকি মায়ের কষ্ট দেখে।

কথা বলে-বলে হারিয়ে যায় রুদ্র। ওর চোখে জলের খেলা চলে। বুকের কষ্টগুলো ভেসে ওঠে মুখে। ইরার হাতটি ধরার জন্য মনটা উচাটন হয়ে ওঠে। বলতে ইচ্ছে করে ভালোবাসার কথা। জীবন এটা যেন অনিবার্য হয়ে উঠেছে। যেন একটু আশ্রয়, বুকের ভেতরের একান্ত কথাগুলো জমা রাখার একটি আশ্রয়। কিন্তু কেন যেন কঠিন পলেস্তরায় বাধা পড়ে সব। যার জন্ম বস্তির একটি ছিন্ন কুটিরে ইরার মতো মেয়ের সাথে তার ভালোবাসা! না না এর চেয়ে বিড়ম্বনা যে আর কিছুতেই হতে পারে না।

আবার বিদ্রোহ করে ওঠে মন। কেন হবে না। মিরা সাম্যে বিশ্বাস করে, পুঁজিতন্ত্রে নয়। মানুষের মূল্য কি হবে তার টাকা বা জন্ম দিয়ে? না, এই পৃথিবীতে বড় সব গুণী মনীষী সমাজ সংস্কারক বিদ্রোহীদের জন্ম দরিদ্র পরিবারে। ক্ষুধার কষ্ট পর্যন্ত করতে হয়েছে তাদের।

ইরার দিকে তাকালে কষ্ট হয়। ওর জীবনে অনেক কষ্ট। তার উপর নতুন করে ওকে কষ্টে ফেলার কোনো মানে হয় না। ইরা রুদ্রকে মেনে নিতে পারে কিন্তু সমাজ আর ওর বাবা-মা কিছুতেই মেনে নেবেন না। তখন কষ্টে পড়বে ইরা। ইরার জন্য না হয় পড়ালেখা করে নিজেকে আরো উন্নত করবে রুদ্র। তবুও কি মুছে যাবে সব। কখনো মোছা যায় না ফেলে আসা অতীত।

ইরার চোখে তাকায় রুদ্র। কেমন স্বপ্ন আর স্বপ্ন ভাঙার খেলা চলে সারাক্ষণ। যেন প্রতিমুহূর্তেই স্বপ্ন গড়া আর ভাঙা। তবুও কি যেন অদ্ভুত এক

আলো লেগে থাকে। সেই আলোতে না আছে ভয়, না আছে শঙ্কা। রুদ্র বলল, বাসায় যাবেন না?

মলিন হাসলো ইরা। গেলেই তো একা। চলুন না আজ আপনাদের বাসায় গিয়ে মায়ের কাছে থাকবো।

কেঁপে উঠলো রুদ্রর সমস্ত শরীর। পাগল! ওটা বাসা নয়। বস্তি। আমাদের বিছানায় ঘুম আসবে না, গা গুলিয়ে বমি আসবে।

দারুণ ক্ষেপে গেল ইরা। আমাকে কি ভাবেন বলুন তো। বুর্জোয়া পরিবারে আমার জন্ম হলেও নিজেকে খুব সাধারণের চেয়ে বড় কিছু ভাবতে শিখিনি আমি।

স্যরি। আমি আপনাকে রাগাতে চাইনি। এখন চলুন, দু'জন দু'দিকে যাই।

উঠলো ইরা।

কিভাবে যাবেন?

যানি না।

হেঁটে যাবেন না তো!

আমার সাথে ইয়ারকি হচ্ছে না! তার পর ভ্রুকুটি করে তাকিয়ে একটি ট্যাক্সি ধরে উঠে পড়লো ইরা। ধীরে-ধীরে গাড়িটি মিলিয়ে গেল পথের বাঁকে। শুধু অপরাজিতদের মতো দাঁড়িয়ে রইল নগর সভ্যতার ল্যাম্পপোস্টগুলো।

বড় আশ্চর্য লাগে সবকিছুই। যখন এই বিজলী বাতি ছিল না তখনও তো নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল সেই হাজার-হাজার বছর আগে। শুনেছি বড় পেটঅলা হ্যারিকেনের পেটে তেল ভরে আকাশ প্রদীপ জ্বালানো হতো রাস্তার দু'ধারে।

লোকাল বাস ধরে ঘুণ্টিঘর এসে নামলো রুদ্র। রাস্তা ফাঁকা। চারদিক সুনসান নীরবতা। হঠাৎ-হঠাৎ দু-একটি গাড়ি শো শা করে এসে দ্রুত মিলিয়ে যায় গাড়িগুলো। পথের পাশে বেওয়ারিশ ক্ষুধার্ত কুকুরগুলোর করুণ চিৎকার আর ক্লান্ত হতে-হতে ঘ্যানঘ্যানানি, অস্থির হয়ে ময়লা ঘাটা খাবার সন্ধান। রাস্তার পাশের উঁচু-নিচু ফুটপাতগুলোতে পরিচয়হীন শিশুদের নির্জীব রাত্রি যাপন। এ যেন মানুষ আর কুকুরেতে মিলে অর্থহীন জীবন।

বুকের ভেতর হু-হু করে ওঠে রুদ্রর। মানুষ আর কুকুরের পার্থক্য কি? বেওয়ারিশ কুকুর আর নাম পরিচয়হীন মানুষ কি একই সূত্রে গাঁথা? তাহলে মানুষ কেন সৃষ্টির সেরা? জন্ম তো বিধাতার ইশারা ছাড়া সম্ভব নয়। মন্থরিত হাঁটছে রুদ্র। পুরো ঘুণ্টিঘরের অলিগলি ঘুরে শীতল সরল বাতাস এসে লাগছে

www.banglainternet.com

রুদ্রর গায়ে। মুহূর্তেই যেন উচাটন হয়ে উঠলো মন। কেনো যেন হাহাকার বুকের ভেতর। ইরা না কি এই ক্ষুধার্ত মানুষগুলো জন্য...। চোখে জল আসতে চায় রুদ্রর। মনে-মনে ভাবে বিধাতা কেনো এই খেলায় মেতে থাকে অহর্নিশি।

ধলুর দোকানের কাছে আসতেই থমকে দাঁড়ালো রুদ্র। দোকান বন্ধ, খোলা বারান্দায় কাঠের বেঞ্চির উপর কে যেন বসে আছে। লোডশেডিং। পুরো ঘুণ্টিঘর যেন ডুবে আছে এক অসহ্য নিস্তব্ধতায়। সম্রাটের দোকানের সম্মুখে নেই কোনো জটলা। অশ্রাব্য, খিস্তি-খাস্তা শোনা যাচ্ছে না। শুধু মায়াবী বেলে জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে পুরো ঘুণ্টিঘর।

জ্যোৎস্নার সেই মায়াবী আলোয় বেরিয়ে এলো চুমকি। আটপৌরে একপেটে শাড়ি আর নিরাভরণ মুখ, যেন জ্যোৎস্না মেঘে অদ্ভুত সুন্দর লাগছে চুমকিকে। মুখে হাসি আর কণ্ঠে উদ্বেগ। চুমকি বলল, তুমি এসেছ? ফিরোজ নেতা এসেছিল তোমাকে খুঁজেতে।

কেন?

তোমার সাথে নাকি কথা আছে তার।

আমার সাথে... কিছু বলেছে?

না।

কিন্তু তুমি এতো রাতে বাইরে কেন?

তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।

আমার জন্য... কেন?

বলছি।

কিন্তু এতো রাতে...

মানুষ নিন্দা দেবে তোমাকে, তাই না। আমি তো নষ্ট মেয়ে মানুষ।

ছি ছি! ওভাবে ভাবছ কেন। বলো কি বলবে?

তোমার কথায় তো সব ছেড়েছুড়ে দিয়ে ঘরে বসে রইলাম। কিন্তু কাল কি খাবো, বলতে পারো?

অকস্মাৎ যেন বিপদে পড়তে হলো রুদ্রর। শুধু চুমকি কেনো কাল সকালে তো প্রত্যেকটি মানুষই এই একই কথা বলবে। এই ব্যাপারটা মাথায় আসেনি। এদের সবাই দিন আনে দিন খায়। জমানো পয়সা থাকে না এদের কাছে। কিন্তু কাজ শুরু করতেই তো আর টাকা আসে না। যেন দিশেহারা মতো লাগছে রুদ্রর।

রুদ্র বলল, আমাদের তো কয়েক দিন ধৈর্য ধরতে হবে চুমকি।

কঠিন করেই চুমকি বলল, পেটে ভাত না থাকলে কেউ শুনবে না তোমাদের কথা।

তাহলে কি করা যায় বলো তো চুমকি।

একটু ভাবল চুমকি। তারপর বলল, এতোক্ষণ আমি ভেবে একটি পথ বের করেছি, দেখ তোমার ভালো লাগে কি না?

কি ভেবেছ?

এখনি তো সবাইকে কাজে লাগনো যাবে না। ধীরে-ধীরে কাজে লাগবে সবাই। তাই বলি কি তোমাদের ফান্ড থেকে কিছু-কিছু টাকা কয়েকজনের মধ্যে বেটে দাও। ওরা প্রতিদিন হকারি করবে। প্রতিদিনের টাকা প্রতিদিন তোমাদের ফান্ডে জমা দেবে। লাভ যা হবে তা দিয়ে চলতে পারবে ওরা। তার পর যখন এখানকার কাজে ঢুকে যাবে তখন ঐ কাজ ছেড়ে দেবে। আরো একটি বিষয় হচ্ছে, যে যে কাজের সাথে জড়িত রয়েছে, ইচ্ছে করলে তারা এক হাড়িতে খেতে পারে। তাহলে খরচও বেঁচে যাবে।

বিস্ময়ের কোনো শেষ নেই রুদ্রর। ওর তো কার্ল মার্কসের ফরমুলা দিচ্ছে। রুদ্র বলল, কিভাবে।

এই ধরো আমরা যারা পাঁচজন সেলাইয়ের কাজ করবো, আমরা এক হাঁড়িতে খেলাম।

রুদ্র বলে, যদি বস্তির সবাইকে এক হাঁড়িতে খাওয়ানো যায়?

আপাতত তুমি তা পারবে না। তাহলে আসল কাজের সমস্যা হবে।

তুমি ঠিক বলেছ চুমকি। কে বলে মানুষ এগিয়ে যেতে পারে না। সুন্দর পথ দেখালে সেই পথে আরো বেশি সুন্দর করে হাঁটতে জানে মানুষ। চুমকি তুমি জানো না। আজ কত বড় একটি কথা বলেছ তুমি। কাল সকাল থেকে কাজ শুরু করবো। সবাইকে বোঝাতে হবে ভালো কিছু করার পিছনে অনেক ত্যাগ করতে হয়। দরকার হলে এক বেলা খাবো আমরা। তবুও ভালো কিছু করতে হবে। তুমি জানো এই সময় কত লোক না খেয়ে মরছে। সোমালিয়ার দুর্ভিক্ষে প্রতি ছয় মিনিটে একটি করে শিশু মরছে। ক্ষুধার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে কোলের সন্তানকে পথে ফেলে ছুটছে মা।

খুবই দুঃখিত হলো চুমকি। তার সাথে উজ্জ্বল একটি আলো ভেসে উঠলো তার চোখে মুখে। তার ভাবনা তাহলে সঠিক। মেনে নিয়েছে রুদ্র। চুমকি তাকিয়ে আছে রুদ্রর দিকে। ওর চোখে জমা আছে অনেক কথা। রুদ্রর হাত ধরলো চুমকি। তোমার কথা এই বস্তির সবাই শুনবে রুদ্র।

আলতোভাবে চুমকির হাত থেকে নিজের হাতটি অবমুক্ত করে নিয়ে রুদ্র

www.banglainternet.com

বলল, আসলে আমি সবার মুক্তির পথের কথা বলছি। যদি তাদের পছন্দ হয় তাহলে অবশ্যই তারা সে পথে হাঁটবে। রাতে কি তুমি খেয়েছ?

খেয়েছি। তুমি?

না এখনো খাওয়া হয়নি।

তাহলে যাও। মা হয়তো অপেক্ষা করছে তোমার জন্য। আর একটি কথা।

কি?

একটু সাবধানে থেকো। আমাদের পিছনে শত্রু লেগে গেছে।

আচ্ছা থাকবো।

চুমকি হাঁটছে রুদ্রর পাশে। রুদ্র ভাবছে সামাজিকভাবে চুমকির সাথে তার পার্থক্য নেই। আর ইরার সাথে বিস্তর ব্যবধান সামাজিক এবং অর্থনৈতিক। তাহলে চুমকি যদি তাকে ভালোবাসতে চায় তাতে তো চুমকির কোনো দোষ নেই। চুমকি তাকে বস্তির রুদ্র হিসেবেই জানে।

৯

আজ খুব সকালে উঠে কাজ শুরু করেছে ঘুণ্টিঘরের মানুষগুলো। কেউ-কেউ করছে বস্তির ভেতরের সেলাই ঘর আর দোকান মেরামত। দশ বারোজন যুবক ছেলেদের টাকা দেয়া হয়েছে ফান্ড থেকে। পাইকারি বাজার থেকে মাল কিনে ফেরি করে বাসায়-বাসায় বিক্রি করবে ওরা। সন্ধ্যায় এসে চালান ফেরত দেবে ফান্ডে। লাভের টাকায় চলছে ওদের পরিবার।

মজিদ আর হাশেম চাচা ফান্ডের দায়িত্বে। ইচ্ছে করেই টাকা পয়সার হিসাবের মধ্যে যায়নি রুদ্র। তাছাড়া মুরব্বিদের কাছে টাকা-পয়সার হিসাব থাকলে ভালো হবে। কিন্তু সব ব্যাপারেই রুদ্র খুব সচেতন। কোনোকিছুই তার অজানা নেই। তার কথা মতোই চলছে সব কাজ।

প্রথমে মেরামত করা হলো পারুলের সেলাই ঘরখানা। এটাই হচ্ছে এই বস্তির স্বপ্নের কোম্পানি। একদিন এটা অনেক বড় হবে। শত-শত মানুষ কাজ করবে এই সেলাই ঘরে। তখন এই বস্তির কারো কোনো দুঃখ থাকবে না। এই সেলাই ঘরকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠবে হস্তশিল্প, শুরু হবে তাঁতের কাজ। নিজেরাই কাপড় বুনে সেই কাপড়ে চলবে বিভিন্ন রকমের সেলাই।

রান্নার দায়িত্ব দেয়া হলো পৌঢ়া আর বৃদ্ধা মহিলাদের। সবাইকে বুঝিয়ে বলা হলো, অন্তত এক মাস তাদের যৌথ পরিবারে খেতে হবে। সবাইকে এক হাঁড়িতে খাওয়ানো গেলে ভালো হতো। কিন্তু এতোগুলো মানুষ এক হাঁড়িতে খাওয়ার ব্যবস্থা করতে গেলে আসলে কাজ ব্যহত হবে। তাই কাজের অবস্থা বুঝে কয়েকটি গ্রুফ করা হয়েছে এবং মাথাপিছু চাঁদা ধরে দেয়া হয়েছে।

প্রায় সবাই রাজি হলো এই ব্যবস্থায়। কেউ-কেউ আপত্তি তুললো। তাদের বুঝিয়ে বলা হলো। মজিদ চাচা বললেন, এক মাসের ব্যাপার। ভালো না লাগলে আমারা তো আলাদা হতে পারবো। আমাদের তো কেউ বেঁধে রাখছে না। তোমরা অমত করছ কেনো মিয়ারা। এই এক মাসে আমাদের সব

www.banglainternet.com

ঠিক হয়ে যাবে। পুরা জীবনটা পার কইরা দিলা, আর এক মাস একটু সহ্য করো।

হাশেম চাচা বললেন, দেখ মিয়ারা, আমাদের কিন্তু বদনাম আছে। আমরা সারাদিন ঝগড়া-ঝাটি করি, গালাগাল করি, খাওয়া লাইয়া কাড়াকাড়ি করি। তোমাদের সবার কাছে একটি মাত্র অনুরোধ। এই একটি মাস আমরা যেন এই সব না করি। মাত্র তো একটি মাস। ভালো না লাগলে আগের মতোই চলতে পারবা যে যার মতো। আর যদি ভালো লাগে তাহলে মিলে মিশে চলতে দোষ কি।

রুদ্র বলল, শুনুন সবাই; আমার কথা শুনুন। একটু বুঝতে চেষ্টা করুন। সারাজীবন আমরা অনেক অত্যাচার সহ্য করেছি। না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায় মরতে হচ্ছে আমাদের। মানুষের লাথি খেতে হয় বিনা দোষে। এসব ভুলে গেলে চলবে না। মাত্র একটি মাস ধৈর্য্য ধরতে হবে আমাদের। এই একটি মাস অন্য কারো কথা শোনা যাবে না। সবাইকে বুঝতে হবে, যত কষ্টই হোক এই এক মাস যেন সবাই এক সাথে থাকতে পারি।

যদি আমরা মনে করি যৌথভাবে থেকে কাজ করলে আমাদের পেটে ভাত জুটছে, তাহলে এই প্রক্রিয়া আমরা চালিয়ে যাবো। আর যদি মনে হয় ভিন্ন থাকাই ভালো তাহলে তাই করবো। আপনারা কি রাজি?

একবাক্য সবাই বলে উঠলো, রাজি রাজি।

এবার সবাইকে এর সুফল সম্পর্কে বলতে লাগলো রুদ্র। আপনারা সবাই শুনুন। নারী-পুরুষ কাজ করতে পারলে সংসার এগিয়ে যাবে। টাকা সঞ্চয় হবে। কেউ-কেউ থাকবে রান্নার কাজে সেটা হবে তাদের চাকরির মতোই। ভেবে দেখুন, প্রত্যেকটি পরিবারের একজন করে লোক শুধু রান্নার কাজ করছে। অর্থাৎ এই বস্তির অর্ধেক মানুষ বসে খাচ্ছে। তাহলে আমাদের উন্নতি হবে কি করে।

ধরুন এই বস্তিতে তিনশ' জন মানুষ রয়েছে। এর মধ্যে একশ' জন পুরুষ যিনি রোজগার করে, অন্য দু'শ জনের মধ্যে একশ' জন নারী অর্থাৎ গৃহিণী আর একশ' জন শিশু যারা স্কুলে যায় বা কেউ-কেউ স্কুলে যায় না কিন্তু কাজও করতে পারছে না এখনো। তাহলে কি দাঁড়ালো। এই একশ' জনের রোজগার তিনশ' জনে খাচ্ছে। তাই চিরকালই গরিব থেকে যেতে হচ্ছে আমাদের। তাছাড়া আমাদের আয় কম। একজনের আয়ে তিনজনের কোনোরকমে খাবার চলে কিন্তু বস্ত্র, চিকিৎসা চলছে না। তাই এই লোকগুলোর রান্নার দায়িত্ব যদি দশজনের উপর দেয়া যায় তাহলে বাকি

নব্বইজন অন্য কাজ করতে পারছে। এবং এই দশজনের জন্যও একটি বেতনের ব্যবস্থা করা হলো। কেউ বেকার থাকলো না।

রুদ্রর কথা শুনে সবাই যেন খুশিতে আত্মহারা। রুদ্রকে যেন মাথায় তুলে রাখাবে সবাই। এই বস্তি কেন, পুরো দেশটাই তো চলাতে পারবে আমাদের রুদ্র। কেউ-কেউ দোয়া করতে লাগলো, কেউ কেউ রুদ্রর মায়ের দিকে তাকাচ্ছে। মায়ের চোখে জল আর কেমন শঙ্কা। আবার কোনো বিপদ হবে না তো ...। কোনো ভালো কিছু করতে গেলে তো বিপদে পড়তে হয়। আবার মনে স্বপ্ন বাসা বাধে। এই তো মুক্তির পথ।

রুদ্র বলে, আমাদের এই কাজ নষ্ট করে দেবার জন্য অনেকেই লোভ দেখাবে আমাদের। নগদ টাকা দেবে। বলবে ভালো চাকরি দেবে। মনে রাখতে হবে তারা আমাদের শত্রু। আমরা যদি লোভে পড়ি তাহলে সেই লোভই হবে আমাদের জন্য মরণফাঁদ। একজনের জন্য সবারই ক্ষতি হবে।

কেউ যাতে এই ধরনের কাজ করতে না পারে সেই জন্য শক্ত একটি টিম গঠন করা হয়েছে। কালা, সম্রাট, বুলেট ওদের সবাই ভয় করে। তাই ওদের দিয়েই সেই টিম গঠন করা হলো। ওরা মনিটরিং করবে সব সময়। প্রতিটি ক্ষেত্রেই থাকবে কঠোর নজরদারি। তাছাড়া ইরা, সাহাদাত, জয়ীতা, ঋতু, কল্লোল, পলাশ ওরা প্রতিদিন এসে দেখাশোনার সাথে নার্সিং করবে সকল কাজের। কেউ যাতে ক্লান্ত হয়ে না পড়ে। প্রথম-প্রথম সপ্তাহে একবার করে এসে সবকিছুই খরব নিয়ে যাবেন রেজাউল করিম স্যার, হুমায়ুন ডাক্তারদের মতো লোকেরা। এভাবে চলতে থাকলে নিশ্চই আগানো যাবে।

আজ আর সারাদিন ঘুণ্টিঘর থেকে বের হয়নি রুদ্র। সকাল থেকে রুদ্রর সাথেই ছিল ইরা, সাহাদাত ওরা। বিকেলের দিকে চলে গেছে সবাই। সারাদিন ধরে প্রখর রোদ বিকিরণে ক্লান্ত সূর্যটা হেলে পড়েছে পশ্চিম দিগন্তে। একটু পরেই সন্ধ্যার পায়ে চেপে নামবে অন্ধকার। এক-এক করে ফিরছে ছেলেরা। সকালে ব্যবসার জন্য টাকা দেয়া হয়েছিল যাদের তারা ফিরছে, শ্রান্ত শরীর, মলিন মুখ। তবুও সুখের হাসি আর কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি রুদ্রর দিকে। সকলেই গিয়ে হিসেব দিতে ঢুকেছে মজিদ আর হাশেম চাচার কাছে।

সূর্য হারিয়ে গেছে পশ্চিম আকাশে। শেষ আলোটুকুর আরক্ত আভা লেগে আছে ধবল মেঘের গায়ে। সারি বেধে সাদা মেঘরা নিরাশক্ত নির্বাক। অন্ধকার রাতের অপেক্ষায় নক্ষত্র ভরা আকাশ। রাত্রি নামলেই যেন জ্বলে উঠবে এক সাথে।

রুদ্রর দু'চোখে আলো। যেন নক্ষত্ররা আলো ঢেলেছে চোখের তারায়।

www.banglainternet.com

শান্ত, শীতল বায়ু প্রবাহিত শীতের বার্তায় ব্যাকুল প্রকৃতি আর উৎকণ্ঠিত হাজারও মানুষ। যাদের জন্ম পথে, বেড়ে ওঠা আর পথের মাঝেই বসবাস। যে কুয়াশা নিয়ে রচিত হয় মধুর গান, কবিতা কোনো চিত্রকরের পটে লেখা হয় মনোমঞ্চকর চিত্র, সেই কুয়াশার তীব্রতায় জীবন যেন অর্থহীন মনে হয় হাজারো মানুষের। এ যেন দুঃসহ জীবনের অনিশ্চিত পথে অনন্ত যাত্রা। নিরন্ন, ভূমিহীন এই সব সুবিধা বঞ্চিত মানুষ যেন মানুষ হতে পারেনি কোনোকালেই।

প্রকৃতির প্রত্যকটি ঋতুতেই বড় অসহায় তারা। তাদের কাছে ঋতুরাজ বা বর্ষার নূপুরপরা ঝুমুর-ঝুমুর শব্দ বড়ই উদ্বেগের। চাঁদের জ্যোৎস্নায় তাদের অন্তর ভরে না বরং ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে। এই নির্মম সত্যটুকু বুকের ভেতর ধারণ করে না বেশির ভাগ মানুষ। যারা ধারণ করে তারা কি? মানব না কি মহামানব? আর যারা ধারণ করে না তারাই বা কি? আমানুষ?

চোখে জল আসে রুদ্রর। আজ তার মনটা দারুণভাবে ভিজে ছিল সারা দিন। কিন্তু কেনো তা বুঝতে পারছে না। মায়ের কপালের কাটা দাগটা চোখের সম্মুখে ভেসে আসছে বার-বার। মনে হচ্ছে সারা দেশে মায়ের কপালেই এই অভিশাপের দাগ লেগে আছে অকরুণভাবে। এ যেন পুরুষের নির্মম বাহু শক্তির বহির্প্রকাশ।

নারী, সে তো কন্যা, জায়া, জননী। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ মুসলিম। তাহলে কেনো তারা নারীর উপর অত্যাচার করবে। তাহলে কি তারা ধার্মিক নয়? ইসলাম ধর্মে নারীকে যতটা অধিকার দিয়েছে সে তো অন্য কোনো ধর্মে নেই। আসলে ধর্মের কিছুই জানি না আমরা। কুরআন, হাদিস পড়ি না। মন গড়া কথা বলি, যে কথা আমাদের পক্ষে যায়।

সন্ধ্যা নামতেই বস্তিতে ঢুকলো ফিরোজ ভাই। সাথে দলের কয়েকজন কর্মী। আজ কালাকে না খুঁজে সোজা রুদ্রদের ঘরের সম্মুখে এসে ডাকলো, রুদ্র ঘরে আছ?

ফিরোজ ভাইর কণ্ঠ শুনেই বেরিয়ে এলো রুদ্র। হেসে হাত মিলিয়ে বলল, কেমন আছেন ভাই?

ভালো। তুমি কেমন আছ?

ভালো। আসেন ভেতরে আসেন।

সবাইকে বাইরে দাঁড় করিয়ে রুদ্রকে অনুসরণ করে ভেতরে এলো ফিরোজ ভাই। খুবই অগোছালো রুদ্রর ঘরটি। এখানে সেখানে ছড়ানো ছিটানো বই। টেবিলে উপর, বিছানায় বইয়ের স্তূপ। একটি বই তুলে হাতে

নিয়ে ফিরোজ ভাই বলল, তোমার কাছে তো অনেক বই দেখছি।

হাসল রুদ্র। বই ছাড়া জানার তেমন কোনো ভালো মাধ্যম নেই আমাদের কাছে।

ঠিক বলেছ তুমি। সবারই বই পড়া উচিৎ।

রুদ্র বুঝতে পারছে না এই লোকটা আসলে কি চায় তার কাছে। কিন্তু কথা তো চালিয়ে যেতে হবে। রুদ্র বলল, আমাদের সম্মুখে যে পাহাড় সমান সমস্যা তার অন্যতম কারণ হচ্ছে আমাদের অজ্ঞতা।

কি রকম?

এই যে আমাদের সামাজিক অবক্ষয়, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, পরিবার হতে শুরু করে রাষ্ট্র পর্যন্ত বিভিন্নভাবে ব্যর্থ হচ্ছি আমরা এর কারণ কি?

সে তো বিস্তর আলোচনার বিষয়।

তা ঠিক। কিন্তু আপনার কাছে কি মনে হয় না শিক্ষার প্রতি আমাদের দারুণ বিরাগের কারণেই এসব হচ্ছে।

কিন্তু এখন তো প্রচুর ছেলেমেয়ে শিক্ষিত হচ্ছে।

সেটা পুঁথিগত শিক্ষা। চাকরি পাবার জন্য। সেই শিক্ষায় নিজের ভাগ্য উন্নয়ন হতে পারে দেশ বা সমাজের কোনো কাজে লাগে না।

একটু ভাবলো ফিরোজ ভাই। তারপর বলল, সেটা আমাদের দারিদ্র্য'র জন্য।

রুদ্র বলল, আপনার কথাটা পুরোপুরি ঠিক নয় ভাই। যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে ধীরে-ধীরে পঙ্গু হবে দেশ। ধরুন একটি পরিবারে যদি পাঁচজন মানুষ থাকে আর তারা যদি যে যার মতো চলতে থাকে স্বার্থপরের মতো। তাহলে সেই সংসারের ভবিষ্যৎ অন্ধকার ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

তাহলে কি করা উচিৎ বলে মনে করো তুমি।

সুশিক্ষা এবং সুনীতি আমাদের খুবই দরকার। আমাদের দরকার আলো। জ্ঞানের আলো। যাতে আলোকিত হবে সমাজ রাষ্ট্র।

তুমি কি একাডেমিক শিক্ষা বাদ দেবার কথা বলছ?

না না, সে কথা বলছি না। আমি বলছি প্রকৃত শিক্ষায় জোর দেবার কথা। শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্য কি?

সুন্দর মানুষ হওয়া।

কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষিত মানুষের মধ্যে কি সেই গুণটি আছে।

কিছুটা অপ্রকৃতিস্থ হয়ে ভাবলো ফিরোজ ভাই। তারপর বলল, আসলে ব্যবস্থাপনার অব্যবস্থাপনার কারণে।

www.banglainternet.com

তার জন্য কে দায়ী বলেন। আমরাই। কোথায়ও সুস্থ রাজনীতি চর্চা নেই। এমন কি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও।

কে বলল নেই। কলেজ-ইউনিভার্সিটিগুলোতে তো রাজনীতির চর্চা রয়েছে।

সেগুলো সুস্থ রাজনীতির আওতায় পড়ে না। যা চলছে তা অসুস্থ ধারা। যদি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া থাকতো তাহলে নিশ্চই নির্বাচনমুখি হতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো। আর নির্বাচনমুখি হলে নিশ্চই বেরিয়ে আসতো ভালো নেতৃত্ব। এক রকম বাধ্য হয়েই তারা সঠিক পথ অনুসরণ করতো, সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীর ভোট পাবার জন্য।

তুমি ছাত্র রাজনীতির অগ্রগতির কথা বলছ রুদ্র?

অবশ্যই। কেনো নয়। ছাত্ররা যদি রাজনীতিবিমুখ হয়ে পড়ে, তাহলে দেশটা চলে যাবে অশিক্ষিত আড়ৎদার, মজুদদার, বুর্জোয়া, ঘুষঘোর-সুদঘোর আমলাদের হাতে। যার কুফল ইতোমধ্যেই দেখছি আমরা। এসব লোক রাজনীতিতে আসে লুট করার জন্য। জনগণের জন্য তাদের অন্তর পোড়ে না।

রুদ্রর দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকায় ফিরোজ ভাই। বস্তির একটি ছেলে এসব কথা বলবে যেন ভাবতেই পারেনি সে। দেশ নিয়ে নতুন করে ভাবছে এরা। সময় এসেছে, পুরাতন জীর্ণতাকে ঝেড়ে ফেলার। ফিরোজ ভাই বলল, রুদ্র তোমার ব্যাপারে দলের সাথে কথা বলেছি আমি।

কেনো ভাই। বুঝলাম না। ওর চোখে প্রশ্ন।

তোমাকে আমাদের দলে নিতে চাই।

আমাকে?

তুমি তো জানো আমরা মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দল। অন্য দলের সাথে আমাদের মিলিয়ে ফেলা ঠিক হবে না। তাছাড়া তুমি যে কাজ করতে যাচ্ছ তা কি তুমি একা করতে পারবে?

একটু ভাবল রুদ্র। ওনার প্রশ্নের সরাসরি উত্তর দেয়া যেত। কিন্তু এখন না। ওনারা মুখেই শুধু মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের দল, কাজে তার কোনো প্রমাণ দিতে পারেনি। অন্য দলের চেয়ে ওনারা আলাদা নয়। রুদ্র বলল, আমি একা হবো কেন। এখানকার সবাই এক হয়ে কাজ করছে। তাছাড়া আপনারা তো আছেন। কোনো সমস্যা হলে নিশ্চয়ই আপনারা হেল্প করবেন।

কিন্তু তুমি যদি দলে আসো, তাহলে দল সরাসরি তোমাকে সাহায্য করবে।

এখনি আমি সবদিকে দৌড়াতে চাচ্ছি না। বুঝতেই পারছেন, নিজের

লেখাপড়া তার উপর এতোসব কাজ। এই কাজটি শেষ হোক তারপর না হয় ...।

কথা শেষ করলো না রুদ্র। আজকাল কিছুটা কায়দা করে কথা বলে সে। আগের মতো রেগে যায় না, গোড়ামি করে না। যে কাজ কথা দিয়ে সমাধান হবে সেখানে তর্ক করে জটিলতা তৈরি করা বোকমী।

একটু ভেবে ফিরোজ ভাই বলল, আজ তাহলে আমি উঠি। যে কোনো সমস্যায় আমাকে বলবে। আমি আছি তোমাদের সঙ্গে। আর আমার কথাটা ভেবে দেখো। তোমাদের মতো যুবকদেরই দরকার।

চলে গেল ফিরোজ ভাই। বুকের ভেতরটা কেমন তেঁতো হয়ে আছে। এই লোকগুলো একেবারেই লজ্জাহীন। দু'দিন আগে আওয়ামী লীগের মন্ত্রীদের নামে নানা কথা উঠেছে। কোনো কাজই ঠিকমতো করতে পারে না। জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ-এর ইউকিলিকসে প্রকাশ হয়েছে অনেক গোপন খবর। এক রকম বিদেশিরাই চালাচ্ছে এই দেশটা। আসলে এই দেশটা নিয়ে কেউ ভাবছে না। দলগুলো ভাবছে তাদের ক্ষমতা নিয়ে। সেই জন্যই পশ্চিমা দেশগুলোর সাহায্য নিতে ব্যস্ত থাকে তারা। এদের কোনো রকম ব্যক্তিত্ব নেই। একটি দেশের আইন প্রণেতা বা মন্ত্রী হয়েও অন্য দেশের মানুষের কাছে নিজেকে বিক্রি করে দিচ্ছে শুধুমাত্র ক্ষমতা আর স্বার্থের জন্য। এই দেশটা চলছে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের কথামতো। এই সমস্ত মেরুদণ্ডহীন স্বার্থপর নেতারা দেশটাকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তা বুঝতেও পারছে না সাধারণ মানুষ।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে বইতে মন দিতে চেষ্টা করছে রুদ্র। সামনে ইয়ার ফাইনাল। নিজের পড়াটাও ঠিক রাখতে হচ্ছে। কিন্তু কিছুতেই মন দিতে পারছে না সে। বুকের ভিতর স্বপ্ন, যেন হাত দিয়ে স্পর্শ করা যাবে। এই মানুষগুলোকে যদি দু'বেলা খাবারের ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ঢাকার পথে-পথে পড়ে থাকা ছিন্নমূল্য মানুষগুলোকে নিয়ে কাজ করা যাবে।

দরজা ভেজানোই ছিল। ঠেলে ভিতরে ঢুকলো চুমকি। মা ঘরে নেই, এই সময় চুমকি... বিস্ময়ের দৃষ্টিতে তাকালো রুদ্র। শ্লথ পায়ে রুদ্রর কাছে এসে দাঁড়ালো চুমকি। মলিন মুখ, অস্থির দৃষ্টি।

মলিন কণ্ঠে চুমকি বলল, সবাই কাজ করছে আর তুমি এখানে...।

কালা ওরা সবাই তো আছে। তাই... কিন্তু তুমি?

একটি কথা ছিল। তারপর রুদ্রর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, রাতে তোমার ঘরে আসা ঠিক হয়নি, না? থাক, আমি যাচ্ছি।

www.banglainternet.com

রুদ্র বলল, যাবে কেনো। কথা শেষ করে যাও। কি বলবে বলো।

ঐ লোকটা একজনকে পাঠিয়েছিল আজ।

কোন লোকটা?

লজ্জায় যেন চোখে জল এলো চুমকির। আহা! কান্নার কি আছে। কোন লোকটি?

আড়ষ্ট হয়ে চুমকি বলল, যে লোকটার সাথে রাতে থাকতাম আমি।

এতক্ষণে চুমকির কথা বুঝতে পারলো রুদ্র। বলল, তুমি কি ভয় পাচ্ছো?

কি করবো বুঝতে পারছি না। লোকটা বদের হাড্ডি। বৌটাকে খুব মারধর করতো আমার সামনেই। বৌয়ের সামনেই আমার সাথে মিশতো। বৌ কিছু বললেই মারধর করতো।

তুমি ভয় পেয় না। তোমাকে কিছুই করতে পারবে না। তুমি ওনার বৌ না।

কিন্তু উনি আমাকে একটি মোবাইল দিয়েছিল...।

সেটা ফেরত দিয়ে দাও।

কিভাবে দেব আমি যেতে পারবো না।

কেনো?

লোকটা আমাকে আটকে রাখবে। এর আগেও সিনেমায় নামাবে বলে দু'টি মেয়েকে নিয়ে ফুর্তি করে ক'দিন পরে বিক্রি করে দিয়েছে।

এতোসব তুমি জানলে কিভাবে?

জেনেছি। গাড়িতে করে বিভিন্ন জায়গায় নিয়ে যেতো আমাকে।

এখন বুঝতে পারছো খারাপ পথ কখনোই ভালো কিছু বয়ে আনে না।

হু-হু করে কেঁদে উঠলো চুমকি। তারপর কান্না জাড়ালো কণ্ঠে বলল, সবই করেছি ক্ষুধার জন্য। উপায় ছিল না। কি করবো, যেখানেই কাজে গেছি এই শরীরটার দিকেই তাকিয়েছে সবাই।

রুদ্র বলল, কাঁদবে না। দুর্বল আর অসহায় মানুষেরা কাঁদে। নিজেকে শক্ত করতে হবে। তুমি ভয় পেয়ো না। ঐ লোকটা তোমাকে কিছু করতে পারবে না। ওনার ফোন নম্বর দাও আমি কথা বলবো ঐ লোকটার সাথে।

তুমি আমার জন্য কোনো ঝামেলায় না পড়ো।

না না কোনো ঝামেলা হবে না। ক'দিন এই বস্তি ছেড়ে কোথায়ও যাবে না তুমি।

জামার মধ্য থেকে মোবাইলটা বের করে রুদ্রর হাতে দিল চুমকি। তার পর বলল, তোমার কাছে রেখে দাও। তাকে ফেরত দিয়ে দিও।

রুদ্র তাকালো চুমকির দিকে। তারপর বলল, তোমাকে কি সিনেমায় নামাবে বলেছিল?

মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল চুমকি।

রুদ্র বলল, ব্যপারটা নিয়ে কারো সাথে আলাপ করো না। তুমি যাও। মন খারাপ করো না।

চুমকি বেরিয়ে গেল। মোবাইলটি ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখলো রুদ্র। বেশ দামি। ওরা নারী দেহের জন্য জীবনের সর্বস্ব দিতে পারে!

www.banglainternet.com

১০

আজ খুব সকালে বাসা থেকে বের হয়েছে ইরা। মনটা খুব খরাপ। শাহবাগ মোড়ে এসে ছোট একটি মেয়ের কাছ থেকে বকুল ফুলের মালা কিনে গন্ধ নিতে লাগলো ইরা। ফুলের চেয়ে পবিত্র এই ধরনীতে আর কিছু আছে বলে মনে হয় না। তাই ফুলের গন্ধে মন ভালো হয়।

রাতে এক মুহূর্তের জন্যও ঘুমাতে পারেনি সে। মা-বাবার কাছে অনেক কথা শুনতে হয়েছে তার। সারা দিন কি সব করে বেড়ায়, ঠিকমতো ইউনিভার্সিটিতে যাচ্ছে না, বস্তির একটি ছেলে তার বন্ধু হয়েছে, সারাদিন বস্তিতেই গিয়ে পড়ে থাকে, উদভ্রান্তের মতো চলাফেলা করে, ওনারা নাকি দেশ উদ্ধার করবে... আরো সব কথা।

শাহানা বেগম বললেন, ওকে বিদেশে পাঠিয়ে দাও। মাথায় ঘুণ ঢুকেছে। সেখানে গিয়েই লেখাপড়া করবে। খুব উগ্র আর অসহিষ্ণু দেখাচ্ছিল শাহানা বেগমকে।

মায়ের কথার কোনো প্রতিবাদ করেনি ইরা। কারণ জীবনের অর্থ তার কাছে একেবারেই ভিন্ন। তার কাছে ঐশ্বর্য, ক্ষমতা, সম্মান হচ্ছে আসল কথা। সে যেভাবেই আসুক। তাকে বুঝিয়ে লাভ নেই। একটি জন্ম-অন্ধকে হাতি বা বকের বিবরণ দেয়ার মতো।

কিন্তু বাবার সাথে কথা হয়েছে অনেক রাত অবধি। ফরিদউদ্দিন সাহেব বললেন, আসলে কি করতে চাও তোমরা?

ইরা বলল, বঞ্চিত মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাই।

তুমি কি জানো ওটা করতে গেলে কত রকম বিপদ হবে।

তুমি বলছ কি বাবা! বিপদের ভয়ে চুপ করে ঘরে বসে থাকবো।

তাহলে কোনো প্রতিষ্ঠিত দলের সাথে কাজ করো।

তাতে কি লাভ?

কেনো, আমরা কি মানুষে জন্য কাজ করছি না?

তোমরা যা করছ তা হচ্ছে বুর্জোয়াদের সেবা আর গরিবদের মেরে ফেলা। না হলে দিনে-দিনে গরিবের সংখ্যা বাড়ছে কেনো? পৃথিবী এগিয়ে যাচ্ছে অথচ বাড়ছে গরিবের সংখ্যা।

কিছুটা বিপদে পড়লেন ফরিদউদ্দিন সাহেব। বললেন, অনেক বছর ধরে রাজনীতি করছি। সময়ের সাথে দেশের অবস্থা আমরা দেখছি। তোমাদের বয়স কম। তাই সহজেই অনেক কথা বলতে পারছ।

আমাদের ভাবনা শুধু আমাদের মনের কথা নয় বাবা। সাধারণ মানুষের মনের কথা। মানুষ আজ দিশেহারা। এবার সমনে এগিয়ে যাবার সময় এসেছে।

কিন্তু তোমরা মাত্র গুটিকয়েক মানুষ সব তো বদলে দিতে পারো না।

আমরা গুটিকয়েক ছিলাম। ধীরে ধীরে অনেকেই যোগ দিচ্ছে আমাদের সাথে। তারা কাজ করতে চায়। মানুষ এখন বিকল্প কিছু ভাবছে বাবা।

ভাবছে, তবে লাভ হবে না। এই দুই মেরু ছেড়ে বের হওয়া এতো সহজ নয়। অনেকেই তো চেয়েছিল অন্য কিছু করতে। কিন্তু পারেনি। কারণ মানুষ এই দুই দলের সাথে আছে। মানুষ মুখে এই দুই দলকে যতই গালাগাল দিক, ভোট দেবার সময় তারা ভুল করে না। যতদিন সাধারণ মানুষ এই দুই দল থেকে সরে না যাবে ততদিন কিছুই হবে না।

আমরা তেমন কিছুই করতে চাই না। কোনো রকম লোভে পড়েও কাজ করছি না আমরা। আমাদের সরকার এবং সরকারের সাথে যোগ দিয়ে কিছু অসৎ মানুষ দেশটাকে লুটে নিচ্ছে। তাদের বিরুদ্ধে আমাদের অবস্থান।

তাদের হাত অনেক লম্বা। তোমরা টিকতে পারবে না।

অসত্য, অশুভ শক্তির হাত কখনো শক্ত হয় না বাবা। তারা চিরকালই দুর্বল।

শুনেছি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে তোমাদের যোগাযোগ রয়েছে।

ঠিকই শুনেছ বাবা। যদি মানুষ চায় তাহলে কেনো আমরা রাজনীতিতে নামবো না। তার জন্য অবশ্যই সময় লাগবে আমাদের।

এতো সোজা ভাবছ কেন। এই সব ছাড়ো, না হলে মারা পড়বে। বিভিন্ন জায়গায় তোমদের নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। তোমাদের নাটেরগুরু ঐ মাস্টারটার চাকরি যাবে। সবাইকে সমস্যায় পড়তে হবে।

সমস্যা নিয়ে কাজ করবো আমরা।

কতটুকু সমস্যা মোকাবেলা করতে পারবে শুনি?

কি হবে বাবা, জেলে আটকে রাখবে। বিনা অপরাধে সাজা হবে। কিন্তু ক'জনকে? আমাদেরও শক্তি কম নয়। বড় দুই দলের অনেকেই আমাদের

www.banglainternet.com

সাথে আছে। তারাও দেশের মঙ্গল চায়। বাবা তোমাদের দল অনেক বড়, কিন্তু অনেক বেশি অগোছালো। আমরা ছোট কিন্তু সুসংগঠিত।

তোমরা বাস্তবতা বোঝ না বলেই এসব বলছ।

সাধারণ মানুষের পাশে থেকে কাজ করা নিশ্চয়ই খারাপ নয় বাবা।

তুমি আমার মেয়ে। দলের মধ্যে আমার অবস্থান খারাপ হচ্ছে। লোকে বিভিন্ন কথা বলছে। তোমাদের উপর অ্যাকশন নেবে ওরা। আমাদের একপেশে করে রাখছে। তোমরা সাপ্তাহিক একটি কাগজ বের করছ। দু'তিন পৃষ্ঠার। খুব নগ্নভাবে লেখা ছাপা হচ্ছে সেখানে।

নগ্নভাবে নয়, বলো সত্য ছাপা হচ্ছে। সরকার যা করছে তাই ছাপছি। এদেশে মাত্র বিশ ভাগ মানুষের কাছে বাকি আশি ভাগ মানুষ কেমন করে জিম্মি হয়ে আছে। তাদের সাহায্য করছে কারা। দিনে-দিনে ভূমিহীন হয়ে পড়েছে কৃষক। শ্রমিক কিভাবে ভিখারি হচ্ছে। ক্ষমতার জন্য দলগুলো বিদেশি শক্তির কাছে দেশের স্বার্থ কিভাবে ভূলুণ্ঠিত করছে। এসব ছাপা হচ্ছে।

কিছুটা ক্ষেপে গেলেন ফরিদউদ্দীন। সেই দিনের মেয়ে এতোসব কথা বলছে। কি করে জানে এরা। বললেন, ধনী দেশগুলো ছাড়া গরিব দেশগুলো চলতে পারে না।

আমাদের কাজ সেখান থেকেই মানুষদের বের করে আনা।

তোমরা স্বপ্ন দেখছ।

স্বপ্ন দেখবো কেনো বাবা। আমরা সত্য কথাটা বোঝাতে চাইছি। ধনীরা দারিদ্র্য দূর করে না। গরিবরা যাতে আরো গরিব হয়ে থাকে সেই জন্য সাহায্য করে। ভিক্ষা দেয়, কখনো ঋণ দেয় সুদে। এরা গরিবদের মেরে ফেলবে না, আবার স্বনির্ভরও করবে না। এরা গরিবকে গরিব বানিয়ে রাখবে। যাতে ওদের আগ্রাসন টিকে থাকে। গরিব যদি মরে যায় তাহলে ওদের দাস হয়ে থাকবে কে। এই নীতিতেই চলে ধনী-গরিবের সম্পর্ক এবং উন্নত আর অনুন্নত দেশের মধ্যে লেনদেন।

এতোসব তোমাকে বুঝতে হবে না। এসব ভূত মাথা থেকে তাড়াও। না হলে বড় বিপদে পড়বে, তখন আমিও কিছু করতে পারবো না।

তুমি কেনো করবে। তোমাকে কিছুই করতে হবে না।

এবার ক্ষেপে উঠলেন ফরিদউদ্দীন সাহেব। তোমার যা খুশি তাই করো। দয়া করে আমাকে কোনো বিপদে ফেলো না। যথেষ্ট বড় হয়েছো তুমি।

তার চোখমুখ ছিল কঠিন। ইরা ভাবল, হয়তো এই বাড়িতেই থাকা হবে না তার। হয়তো টাকা-পয়সা বন্ধ হয়ে যাবে। তাহলে কি করে চলবে সে।

আগে থেকেই কোনো ব্যবস্থা করে রাখতে হবে। বন্ধুদের মধ্যে অনেকেই নিজের খরচ নিজে জোগাচ্ছে। প্রয়োজনে তাকেও তাই করতে হবে।

ক্লাস শেষ করে মধুর ক্যান্টিনের সম্মুখে এসে জড়ো হলো সবাই। মিরা বলল, তোর কি হয়েছে?

ঈষৎ হেসে ইরা বলল, না কিছু না।

রানা বলল, তাহলে এরকম লাগছে কেনো তোকে। মনে হচ্ছে রাতে ঘুম হয়নি।

জয়ীতা বলে, প্রেমে পড়িসনি তো?

হা-হা করে হেসে ফেললো সবাই। ইরাও হাসার চেষ্টা করলো ওদের সাথে। তারপর বলল, শরীরটা ভালো নেই। কথা ঘুরিয়ে বলল, রুদ্র কোথায় রে?

কল্লোল বলল, এখনো ক্লাস করছে।

শাহাদাত বলল, দেখ গিয়ে ক্লাস শেষে আবার লাইব্রেরিতে গিয়ে বসেছে কিনা। যে রকম মনোযোগ দিয়ে পড়ে, সব কিছু ভুলে যায়।

ইরা বলল, সবাই এরকম মনোযোগী হওয়া উচিৎ।

কল্লোল, রুদ্রর জন্য এতো দরদ।

আরে এখানে দরদের কি দেখলি। সত্যি যা তাই তো বললাম।

মিরা বলল, রুদ্র সত্যিই খুব ভালো। ইরা কেনো, আমরাও ওকে পছন্দ করি।

শাহাদাত বলল, তবুও ইরার পছন্দটা অন্যরকম।

হাসলো ইরা। ফালতু বকবি না।

জায়ীতা বলল, কে কে যাবি অর্থ সংগ্রহে।

ইরা বলল, কিসের জন্য?

ভুলে গেলি, আজ না সোমালীয়ান দুর্ভিক্ষে আক্রান্তদের জন্য টাকা তোলার কথা।

দাঁতে জিব কাটলো ইরা।

সাহাদাত বলল, তোকে যেতে হবে না ইরা। আজ তোকে অসুস্থ লাগছে।

এরই মধ্যে এসে দাঁড়ালো রুদ্র। সবাই দেখছি চলে এসেছ, আমি লেট।

শাহাদাত বলল, তাহলে আমরা উঠি সময় নেই।

রুদ্র বলল, সজিব ওরাও যাবে তোমাদের সাথে। আমার সাথে কথা হয়েছে।

www.banglainternet.com

শাহাদাত বলল, রাতে আমি ঘুন্টিঘরে আসবো রুদ্র।

আসিস। আমি আছি।

ওরা প্রথমে ইউনিভার্সিটি এলাকা ঘুরে বেরিয়ে গেল। এর পর যাবে আবাসিক এলাকাগুলোতে। শুধু টাকাই নয় পুরনো জামা-কাপড় তোলা হবে।

দু'কাপ চা নিয়ে ইরার পাশে এসে বসল রুদ্র। এতোটা বিষণ্ন আর কখনোই দেখায়নি তাকে। মনে হচ্ছে, চিরদুঃখী আর অসহায়। ইরার দিকে চায়ের একটি কাপ এগিয়ে দিয়ে রুদ্র বলল, কি হয়েছে?

কোনো কথা নেই ইরার মুখে। উদাস দৃষ্টি আর দৃষ্টির মাঝে হতাশা। ললাটে ভাবনা রেখা। কোনো কথা না বলে, চা শেষ করে একটি সিগারেট ধরালো রুদ্র। ইরা নির্বিকার। আজকাল খুব সিগারেট ফুকছে রুদ্র। দেশি সিগারেট। শুধু সিগারেট কেনো বিদেশি কোনো কিছুরই ধার ধারে না সে।

সিগারেট শেষ করে রুদ্র বলল, কি হয়েছে। মন খারাপ কেনো?

উদাস কণ্ঠে ইরা বলল, মনে হচ্ছে বাসায় থাকতে পারবো না।

প্রথমে যেন শুনতে পেলো না রুদ্র। কিছুটা বিস্মিত হয়ে বলল, কেনো?

মা বলেছেন বিদেশে পাঠিয়ে দেবে। সেখানেই পড়ালেখা করতে হবে।

কেনো?

আমি নাকি দেশ উদ্ধার করতে নেমেছি। এসব আমার কাজ নয়। তার জন্য বিপদে পড়তে হবে। আমাদের বিরুদ্ধে অনেকেই... যে কোনো সময় পুলিশের হাতে ধরা পড়বো, জেলে পচে মরতে হবে, বস্তির ছেলেমেয়েদের সাথে মিশছি... ধীরে-ধীরে সব বলল ইরা।

ইরার কথা শুনে হাসতে লাগলো রুদ্র। রুদ্রর হাসি দেখে খুব ক্ষেপে গেল ইরা। আশ্চর্য! আপনি হাসছেন। ধুর, আপনার সাথে থাকাই ভুল হয়েছে। ওদের সাথে গেলই ভালো হতো। হাঁটতে শুরু করলো ইরা।

হাসি বন্ধ করে উঠলো রুদ্র। সেরেছে, রাগলে তো আর রক্ষা থাকে না। ইরার পাশে হেঁটে বলল, আরে রাগছেন কেন?

না রাগবো না! আপনার সাথে... চোখ বড়-বড় করে রুদ্রর দিকে তাকালো ইরা।

ওকে খুব দুঃখি-দুঃখি দেখাচ্ছে আজ। এর আগে আর কখনোই এতোটা মলিন দেখায়নি ইরাকে। হয়তো রাতে না খেয়ে ছিল। সকালেও না খেয়ে আছে। রুদ্র বলল, যে মানুষটি পুরো দেশ উদ্ধারে নেমেছে, তাকে কি এতোটা ভেঙে পড়লো চলবে।

চোখের জল মুছলো ইরা। নিজেকে সংবরণ করে বলল, মন যেন মানতে চায় না। আপন মানুষ যখন...।

বাদ দিন। নিশ্চয়ই রাত থেকে না খেয়ে আছেন।

চোখে জল নিয়েই হাসলো ইরা। মুখে প্রশান্তি আর চোখে জল। রুদ্র তাকিয়ে আছে। ইরা বলল, খুব ক্ষুধা পেয়েছে।

চলুন। ইরার হাত ধরলো রুদ্র। ইরা তাকালো রুদ্রর দিকে। আপন কারো ছোঁয়ায় কষ্টের উপশম ঘটে। তাহলে কি রুদ্র তার আপন। বুকের ভেতরটা যেন কেমন করে উঠলো ইরার। হাতটি ছাড়িয়ে না দিয়ে হাঁটতে লাগলো রেস্টুরেন্টের দিকে।

রুদ্র তাকিয়ে আছে ইরার দিকে। এমনভাবে খাচ্ছে যেন বহুদিন ভাত খায়নি সে। কোনো দিকে না তাকিয়ে দ্রুত খেয়ে যাচ্ছে ইরা। কথা বলছে না। ক্ষুধা বোধহয় কাউকেই ক্ষমা করে না। ধনী গরিব সবাইকে পোড়ায় একভাবে।

আজ বিল মিটিয়ে দিল রুদ্র। রেস্টুরেন্ট থেকে বের হয়ে ইরা বলল, আজ হাঁটবো।

কোথায়?

রাজপথ ধরেই হাঁটবো।

কতক্ষণ?

যতক্ষণ না ক্লান্ত হয়ে ভেঙে পড়ে শরীর।

দু'জনে পাশাপাশি হাঁটছে ওরা। মানুষের ভিড়, রাস্তায় চলা গাড়ির হর্ণ আর সূর্যের তাপ। এখনো গরমের তেজ রয়েছে ঢাকায়। ইরা বলল, ইনটোডাক্টশন পড়েছেন?

কার?

উইলিয়াম ব্লাক'য়ের।

না তো পড়িনি। শোনাবেন?

হাসল ইরা, তার পর শ্লথ পায়ে হেঁটে-হেঁটে আবৃত্তি করতে লগালো—

Piping down the valleys wild
Piping song of pleasant glee
On a cloud I saw a child.
And he laughing said to me.

www.banglainternet.com

Pipe a song about a Lamb:
So I piped with marry chear,
Piper,...

অকস্মাৎ এক টুকরো মেঘ এসে ঢেকে দিল সূর্যটাকে। মন্থরিত শুরু হলো শীতল সমীরণ। এ যেন অনন্ত লোকের ঐশ্বরিক কোনো খেলা। ভালো লাগার এক মাহামায়ায় ভরে থাকে অন্তর। কোনো কথা বলছে না রুদ্র। মাঝে-মাঝে ইরার হাতের ছোঁয়া লাগছে ওর হাতে। কথা বলছে না। যেন কথা বললেই বিলিন হয়ে যাবে এই ভালো লাগার ক্ষণটুকু। ইরা আবার আবৃত্তি করতে লাগলো, অনুবাদ।

জনশূন্য উপত্যকায় বাজাইনু বাঁশি,
আনন্দ-রাগিনী জড়ো হলো আসি।
এক শিশু দেখি আমি মেঘমালা পরে,
হেসে-হেসে সে শিশু অনুরোধ করে

গান করো, গান করো, মেষশাবকেরে,
তাই আমি সুর তুলি অতি আনন্দের।
বংশীবাদক বাজাও আবার তোমার সে গান
কেঁদে উঠে মেঘের শিশু শুনে সেই তান।

নির্মোহ এক অন্তর ক্ষুধায় ইরা হাত ধরলো রুদ্রর। কোনো কথা বলতে পারছে না। যুগল হাতের বন্ধনে উদ্‌গত এক উষ্ণতা আর কাব্যিক মায়ায়, ভালোবাসার পথে মিশে হারিয়ে যেতে লাগলো দু'জন। এ যেন চিরকালের সবচেয়ে মহৎ, অবর্ণনীয় ভালোলাগা। হয়তো এই জীবনে আর কখনোই ফিরে আসবে না এই নির্মোহ অতিরোমাঞ্চকর এই ক্ষণটুকু। এ যেন প্রথম, চির নতুন চির আনন্দের অজানা এক ভালোলাগা। এই অঙ্কুর রোপণে গজাবে দু'পত্রের এক চিরসবুজ বৃক্ষ। সেখান থেকেই বেরিয়ে পড়বে শাখা প্রশাখা, রঙ, রূপ, মুকুলিত, প্রস্ফুটিত ফুলের গন্ধে আকুল হবে পৃথিবী। সমস্ত চরাচর হাসবে। অন্তরীক্ষের পথে হবে কোনো পূর্ণ যাত্রা।

রুদ্র ভাবল, ইরা আবৃত্তি করলো সূচনা কবিতাটি। কিন্তু বুকের ভিতর আজ এ কিসের সূচনা হলো তার? কিছুতেই যেন নিজেকে দমন করা যাচ্ছে না। বুকের ভিতর এক ঘূর্ণি বায়ুর দোলাচল— অজানা, অপ্রকাশিত।

ইরা বলল, আজ ঘুণ্টিঘরে গেলেন না। কাজের প্রতি উদাসীনতা ভালো দেখাবে না।

যে কাজ সারা জীবন ধরে করতে হবে, তা নিয়ে তাড়াহুড়ো করতে চাই না। এই পর্যন্ত তাড়াহুড়ো করে একটি পর্যায় পর্যন্ত এসেছি। এখন ধীরে সুস্থে দেখেশুনে আগাতে চাই।

ঠিক বলেছেন। সারা জীবনই তো করতে হবে। যদি ঝড় আসে রুদ্র?

আসবেই। তার জন্য মনকে শক্ত করতে হবে। আর আমরা তো একজন অন্যজনের পাশে আছি।

আজ ঘুণ্টিঘর এসে সবার কাজের খবর নিয়ে, হিসেবে চোখ বুলিয়ে সবাইকে নিয়ে বসল রুদ্র। কালা, বুলেট, সম্রাট, মজিদ চাচা, হাশেম চাচা, পারুল, চুমকি, নূরু ওরা সকলেই এলো। কাজ ভালোই চলছে। সবাই আগ্রহ নিয়ে কাজ করছে। কালা, বুলেট ওদেরকে আপাতত ডাকছে না মোস্তফা মল্লিক। কালা বলে এসেছে ওর নিজের কিছু কাজ আছে। তাছাড়া কালার দিকে এখন পুলিশি নজরদারি চলছে। মোস্তফা মল্লিকও চাইছে কয়েক মাস অফ রাখবে কালাকে। এভাবে হয়তো ধীরে-ধীরে ওদের হাত থেকে রক্ষা পাবে কালা বুলেট ওরা।

মজিদ চাচা বলল, ভালো সংবাদ আছে।

কি চাচা? বলল রুদ্র।

আমাদের পাশের লোকগুলো সব আমাদের সাথে কাজ করতে চায়।

একটু ভাবল রুদ্র। তার পর বলল, এখনি ওদের আমাদের সাথে জড়ানো ঠিক হবে না। আগে আমাদের সফলতা আসুক, পরে ওদের নিয়ে কাজ করা যাবে। এভাবে ধীরে-ধীরে আমরা কাজ করবো।

রুদ্রর কথায় সমর্থন দিল সবাই। কথা বলছিল, এরই মধ্যে কোথা থেকে যেন এসে হাজির হলো বিলু। ওকে দেখে তেড়ে উঠলো সম্রাট— তোর কত বড় কলিজা, আবার ঢুকছস এই ঘুণ্টিঘরে।

কালাও উঠলো বিলুকে ধরতে। অবস্থা দেখে দ্রুত গিয়ে সামনে দাঁড়ালো রুদ্র। তোমরা উত্তেজিত হচ্ছ কেন। এখন মারামরি করার সময় নয়। যা করার ঠাণ্ডা মাথায় করতে হবে।

ওদের কথা শুনে এলেন মরিয়ম বেগম। মায়ের কাছে গিয়ে বিলু বলল, মা আমার অন্যায় হইয়া গেছে। যেই বিচার হয় আপনারা করেন, আমি এইহানে থাকমু।

www.banglainternet.com

মা বললেন, মজিদ ভাই। ওরা আমাদেরই ছেলে, একটা ভুল করছে। তার জন্য অনুতপ্ত হয়েছে। ছেলেকে কি ফেলে দিতে পারবেন।

কালা বলল, না চাচি ওর কতা কইবেন না। ও বেইমান। আবার বেইমানি বি করবো। কোন মতলবে আইছে তাই দেহেন।

এবার কাঁদো কাঁদো হয়ে কলার হাত ধরলো বিলু। গুরু তুমি আমাদের বেইমান কইতাছ। তুমি আমারে মারো গুরু। আমি তোমাগো কতা ছাইরা আর কোন কাম করমু না। এই কয়দিন আমায় রাস্তায় রাস্তায়...।

চোখে জল এসে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো বিলু। মায়ের খুব মায়া হলো। মা গিয়ে ওর মাথায় হাত বোলাতে লাগলো। তার পর বলল, কালা, বাবা ওদের তোমরা একবার সুযোগ দাও। এর পর কিছু করলে আর কথা থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত ওকে ক্ষমা করে দেয়া হলো। এখন থেকে ও কালাদের সাথে সাথে থাকবে। কাল থেকে কাজ শুরু করবে। মা নিয়ে গেলন বিলুকে। তিন দিন ধরে না খেয়ে আছে। ক্ষুধায় ওর হাত পা সব কাঁপছে।

রাত বাড়তে থাকে। ঘুন্টিঘর আবার নিশ্চুপ হয়ে পড়ে। এখন আর আড্ডা চলে না কোথায়ও। সবাইকে কাজ করতে হয়। সকাল বিকেল ইরা, আদিত্য, শাহাদাত, জয়ীতা ওরা এসে ওদের সাথে অনেক রকম কথা বলে, ওদের স্বপ্ন দেখায়। সুখের স্বপ্ন। এক সাথে মিলে কাজ করতে অনন্দ হয় সবার। মাঝে-মাঝে স্যার আর ডাক্তার সাহেব আসেন। তাদের সাথে আসে অনেক গুণী মানুষ। তাদের কথায় সত্যি জাদু আছে। যেন কোনো পাপ ঢুকতে না পরে কারো মনে। কাজ এগোয়ে গেলে আর বোঝাতে হবে না কারো। সবাই এমনিতেই কাজ করবে। তখন মাঝে-মাঝে শুধু ব্রিফ করা। বাচ্চাদের পড়াচ্ছে মা। কয়েকজন ছেলেমেয়েকে স্কুলে ভর্তি করা হয়েছে।

রাত তখন প্রায় বারোটা। ঘুম পাচ্ছিল না রুদ্রর। বাইরে এসে দাঁড়িয়ে। রাতের হাওয়াটা শীতল। শীত-শীত লাগছে। কেমন উচাটন ভাব হয়েছে মনটার। ইরার কথা মনে পড়ছে। কেমন যেন রোমাঞ্চকর হয়ে উঠেছে চারপাশ। আকাশে চাঁদের আলো। আহ শুক্লপক্ষের রাত। কয়েকদিন পরেই পূর্ণ চাঁদ লাগবে আকাশের গায়ে। ঘরের সম্মুখে আনমনে দাঁড়িয়ে রয়েছে রুদ্র। মা ঘুমিয়ে পড়েছে। আর বিলু সংজ্ঞাহীনের মতো পড়ে আছে। ওকে টেনেও তোলা যাবে না। ক'দিন ঘুমায়নি কে জানে।

অকস্মাৎ একটি ছায়ার মতো কালার ঘরের দিকে যেতে দেখলো রুদ্র। মনে হলো মেয়েমানুষের ছায়া। ভূত-প্রেত এলো না কি। ধুর! কি সব ভাবছে, এই ঢাকা শহরে ভূত আসবে কি করে। শুনেছি ওরা তো থাকে গভীর বনে।

কিছুটা কৌতূহল হলো রুদ্রর। না কি চোখের ভুল।

নিজের উপর কিছুটা বিরক্ত হলো রুদ্র। এতো ভাবনার কি আছে, কালা তো আর মেয়ে মানুষ নয় যে ওর ঘরে যাওয়া যাবে না। গিয়ে দেখলেই হয়।

এদিক ওদিকে তাকিয়ে শ্লথ পায়ে এগিয়ে গেল রুদ্র। দরজা ভেজিয়ে রাখা। কখনো দরজা বন্ধ করে না কালা। জমেও যায় না ওর ঘরে। রুদ্র গিয়ে দাঁড়ালো দরজার সম্মুখে। ভিতরে থেকে ফিসফিস কথার শব্দ। ভালো করে কান পাতল রুদ্র। একটি নারী কণ্ঠের আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে।

কোনো কথা না বলে দরজার ঝাপি ঠেলে মাথা ঢোকালো রুদ্র। মুহূর্তেই যেন পায়ে শিকড় গজিয়ে গেল তার। না আসাই ভালো ছিল। শব্দ করে আসলে ভালো হতো। ওরা অন্তত সতর্ক হতে পারতো। বেশি কৌতূহল ভালো নয়। অতিরিক্ত কৌতূহলে সাধারণ জ্ঞান লোপ পায়। আবার ভাবল ভালোই হয়েছে। নিজের চোখে না দেখলে ব্যাপারটা নিয়ে খোলাখুলি আলাপ করা যেতো না।

কিছুই টের পাচ্ছে না ওরা। বিছানায় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে চুমকি। হারিকেনের ডিমা আলো পড়েছে ওর মুখের উপর। ওর পাশেই শুয়ে ওকে জড়িয়ে ধরে উগ্র ভঙ্গিতে চুষছে ওর ঠোঁট আর হাত দিয়ে বুকের কাপড় খুলে ফেলার চেষ্টা করছে কালা। কাম জাগরণে দু'জনেই যেন উন্মাদ। কোনো দিকেই যেন খবর নেই। মাঝে-মাঝে শিৎকার করে যাচ্ছে চুমকি। এবার উন্মাদের মতো চুমকির দেহ থেকে একটি একটি করে সব বসন খুলে ফেলে যখন...।

এমনি সময় দরজার বাইরে গিয়ে কালাকে ডাকলো রুদ্র। কালা কি ঘুমিয়েছিস?

মুহূর্তেই একটি ঝড় বয়ে গেল। কালার কণ্ঠ কাঁপছে। কে?

ঘরে ঢুকে গেল রুদ্র। ততক্ষণে নিজেকে সংবরণ করে নিয়েছে চুমকি। হাত দিয়ে ঢেকে রেখেছে মুখ, কালা দাঁড়িয়ে আছে আড়ষ্ট হয়ে, মুখে আপরাধের ছাপ।

রুদ্র বলল, কালা...!

রুদ্রর কথা শেষ না হতেই কালা বলে উঠলো, গুরু আমি ওরে বিয়া করমু। আমাগো কথা হইছে। কাইলই তোমারে জানাইতাম। তুমি ওর লগে কতা কও।

বলেই দ্রুত প্রস্থান করলো কালা। রুদ্র বলল, চুমকি...!

নত মুখে চুমকি বলল, ও ঠিকই বলেছে। আমি ওরে বিয়ে করবো।

www.banglainternet.com

মুহূর্তেই যেন কেমন হয়ে গেল রুদ্র। আর যেন কথা বলতে পারছে না সে। কেমন বোধহীন লাগছে। তাহলে কি...!

আর কিছুই বলতে পারলো না রুদ্র। অদ্ভুত এক আবেগ জড়ানো কণ্ঠে চুমকি বলতে লগালো, তুমি তো দেবতা। সংসারের অনেক কিছুই স্পর্শ করে না তোমাকে। তুমি আমাদের পেটের ক্ষুধার ব্যবস্থা করছো। কিন্তু শরীরেরও বড় ক্ষুধা হয়, বড় জ্বালায়। তাছাড়া শরীরটা তো নষ্ট করে ফেলেছি বিপথে। এখন পুরুষের শরীর না পেলে জ্বালিয়ে শেষ করে দেয়। জানি আমাকে ঘৃণা করবে তুমি। কিন্তু কি করবো বলো।

না না তোমাকে ঘৃণা করবো কেন।

তোমার কথা বিশ্বাস করি। তুমি দেবতা। তুমি থাকো আমাদের অন্তরে। তোমাকে ছোঁয়ার সাধ্য আমাদের নেই। আমাদের জন্য দোয়া করো। আমরা বিয়ে করবো।

ম্লান কণ্ঠে রুদ্র বলল, ঠিক আছে।

তারপর পায় পায় বেরিয়ে এলো ঝুপড়ি থেকে।

১১

সাপ্তাহিক কাগজে রুদ্রর একটি লেখা ছাপা হয়েছে আজ। প্রবন্ধটির শিরোনাম, পাকিস্তানের ২৫ বছর আর বাংলাদেশের ৪০ বছর। তা নিয়ে বিশাল হৈ চৈ পড়ে গেছে অনেক মহলেই। বিভিন্ন পাবলিক প্লেসে সেঁটে দেয়া হয়েছে, অনেকগুলো সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে দেয়া হয়েছে। দেয়ালের সাথে সেঁটে দেয়া কাগজ দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে পড়ছে আর মাথা নেড়ে কেউ-কেউ বলছে, ঠিক লিখেছে। দেশটাকে জাহান্নাম বানিয়ে রেখেছে শালারা। এই শালাই যত নষ্টের মূল। মনে হয় দেশটা ওগো বাবার।

পাকিস্তানিরা পঁচিশ বছরে বাংলাদেশ থেকে যত টাকা লুট করে নিয়েছে তার চেয়ে শতগুণ বেশি লুট হয়েছে এই চল্লিশ বছরে। ওরা আর আমরা কখনোই এক জাতি ছিলাম না। তাই আমাদের প্রতি ওদের অবিচার চলেছে। কিন্তু এখন এক ভাই আর এক ভাইয়ের টাকা লুট করছে নির্দয়ভাবে। সরকারি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানে বছরের পর বছর ধরে লুট চলছে কোটি-কোটি টাকা।

তখন দু'প্রদেশের মধ্যে বিশাল বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল পাকিস্তানিরা। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো লোককে পশ্চিমে যেতে হলে পাসপোর্ট প্রয়োজন হতো। কিন্তু পশ্চিমারা যখন পূর্বে আসতো তখন পাসপোর্ট প্রয়োজন হতো না তাদের। চাল, চিনি, আটার মতো নিত্যপণ্যের দামেও ছিল বিশাল ব্যবধান। আর চাকরি ব্যবসা তো ছিলই। সরকারি বড় কোনো পদে বাঙালির চাকরি হতো না।

এসব বৈষম্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশ স্বাধীন করেছে বাঙালিরা। আজ সময় এসেছে, দেশের শত্রুদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর। তার জন্য দরকার সৎ সাহসী মানুষ। আমরা নিজেরা শেষ হয়ে যাচ্ছি ধীরে-ধীরে আর আগামী প্রজন্মকে এনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছি সেই একই পথে।

যাদের শ্রমে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে পুরো দেশ। এদেশে তাদের অবস্থা সবচেয়ে করুণ। মুখে রক্তবমি তুলে দিন রাত খেটে চলছে তারা। কৃষক

www.banglainternet.com

শ্রমিক আছে সবচেয়ে অবহেলায়। যেন মানুষ নয় তারা। একজন শ্রমিকের বেতনে তার নিজের পেটে ভাত আর মাথাগোজার জন্য একটু জায়গা জোগাড় করাই কষ্ট হয়ে পড়ে।

কিন্তু সময়ের সাথে থেমে থাকে না কিছুই। বিয়ে সংসার সন্তান... শুরু হয় জীবনের শেষ দিন গোনা। সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি আর অর্ধাহারে অনাহারে কোনো রকমে পড়ে থাকে। একেই কি জীবন বলে? মিল কল-কারখানায় কোনো রকম দুর্ঘটনা বা বয়সের ভারে যখন নুইয়ে পড়ে শরীর অসহ্য মনে হয়, তখন তাদের অদৃষ্ট বাধা পড়ে মানুষে হাতে।

মানুষের কাছে হাত পেতে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো উপায় থাকে না তাদের। কেউ দয়া করে দু-এক টাকা দেয়, আবার কারো কাছ থেকে জোটে লাথি, ঘুষি, অশ্রাব্য যত কথা।

ধীরে-ধীরে ভূমিহীন হচ্ছে কৃষক। বর্গাচাষিরা সর্বস্ব হারাচ্ছে জমির মালিক আর বুর্জোয়া শ্রেণীর কালো থাবায়। যদি একটি দেশের সরকারের অর্ধেকই হয় বুর্জোয়া অথবা সেই সরকার নিয়ন্ত্রিত হয় বুর্জোয়া শ্রেণী দ্বারা, তাহলে সে দেশের কৃষক-শ্রমিক সাধারণ মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ হওয়া স্বাভাবিক।

যা ঘটেছে আমাদের দেশের বেলায়। কৃষি-উপকরণের সাথে উৎপাদনের কোনো মিল নেই। কারণ কৃষিকাজ করে কৃষক। আর কৃষি-উপকরণ তৈরি করে বুর্জোয়া শ্রেণী। ঠিক তেমনি ফসলের বিক্রয় প্রক্রিয়ার মধ্যে রয়েছে চরম জোচ্চুরি। মজুতদার কৃষকের কাছ থেকে অল্প মূল্যে ফসল ক্রয় করে মজুত করে দেশের মধ্যে একটি কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে। তার পর সেই ফসলই চড়া দামে বিক্রি করে মজুতদার। এতে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে কৃষক, সাধারণ মানুষ। এই সব মজুদদারদের হাতে সরকার বন্দি। কারণ তাদের টাকায় চলে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল।

এই দেশটা যেন বিশাল একটি জেল। আমরা সবাই সেই জেলে বন্দি। কারারক্ষী অর্থাৎ শাসক শ্রেণীর যেন প্রাচীন সামন্তরাজ। এই বন্দিদশা থেকে বেরিয়ে আসতে পারছে না মানুষ। শুধু বিধাতার উপর ক্ষোভ, অদৃষ্টের অভিশাপ আর লোমের গোড়ায় আত্মহত্যার প্রবণতা।

সকাল গড়িয়ে যেতেই ঘুণ্টিঘরে এসে হাজির হলো মিরা, শাহাদাত, আদিত্য ভাই, ইরা। কাগজটা খুলে মায়ের কাছে দিল ইরা। লেখাটা যেন এক নিঃশ্বাসে পড়ে নিয়ে আঁচলের খুটে চোখের জল মুছলেন মা। বাংলার প্রতিটি মা যদি

তাদের গর্বে রুদ্রর মতো ছেলের জন্ম দিতে পারতো তাহলে আর কোনো দুঃখ থাকতো না।

কিন্তু রুদ্র যেন নিঃস্পৃহ। মা তাকিয়ে থাকে ছেলের দিকে। এই অল্প বয়সেই যেন কেমন রাশভারী ভাব। মুখ যেন তামাটে, গম্ভীর আর জ্ঞানী মানুষের মতো। কঠিন বাস্তবতা ওর প্রাণটা শক্ত করে দিয়েছে। বই পড়ে আর ভেবে-ভেবে শিখেছে অনেক কিছুই।

ধুম কাজ চলছে বস্তিতে। শুধু শিশুরা ছাড়া বসে নেই কেউ। বাঁশের চটি করে ঘেরা দিয়ে তার মধ্যে হাঁস-মুরগি পুষছে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। একটু জায়গাও যেন ফাঁকা নেই কোথাও। এক ঘরের মধ্যে গাদাগাদি করে থেকে কাজের জায়গা বের করে নিচ্ছে মানুষগুলো।

ওদের দেখলে বুকের ভেতরটা কেমন যেন করে ওঠে রুদ্রর। মুক্তির পথে হাঁটছে সবাই। নিজের সবটুকু দিতে প্রস্তুত সবাই। শুধু যেন পেট ভরে খেয়ে ক্ষুধার জ্বালাটা মিটাতে পারে।

ওদের কাজ দেখে বুকের ভেতর একটি ঘূর্ণিবায়ু এসে দূরে নিয়ে যায় সব মেঘ। নতুন আশা জাগে। এভাবেই কাজ করা উচিৎ দেশের সব মানুষের। বৃটেনের সরকার যখন শ্রমাগার গড়ে তুললো জাতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য। সেখানে কাজের চাপ এতোই বেশি ছিল যে, অনেক সময় শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াতে যাবার সময় পেতো না মায়েরা। ধনীদের বাধ্য করা হয়েছিল গরিব আত্মীয়দের সাহায্য করতে।

সবাই কাজে নেমেছে আজ। কালা ওদের নিয়ে গিয়ে ব্রিফ করছে আদিত্য ভাই। ওরা মন দিয়ে শুনছে তার কথা। মগজ ধোলাই করা। যেন মাথায় খারাপ কিছু প্রবেশ না করে। বিলু কাজ করছে সবচেয়ে বেশি। কারো সাথে কেউ হিংসা করছে না। কষ্টে সবার মুখ কালো হয়ে গেছে। তবুও যেন হাসি লেগে থাকে ঠোঁটের কোণে। সবাই এক সাথে কাজ করছে নিজেদের কাজ। এর মধ্যে যেন স্বর্গের সুখ মেশানো। একটু এগিয়ে যেতে পারলেই সম্মুখে পরিষ্কার পথ। সে পথেই যেতে হবে।

সেলাই ঘরটি আরো বড় করা হয়েছে। মেশিন উঠেছে আরো চারটি, এক পাশে বাটিকের কাজও শুরু হয়েছে। এসব কাজ মেয়েদের। এর মধ্যে সেলাই আর বাটিকের উপর প্রশিক্ষণ করানো হয়েছে পারুল, চুমকি ওদের। ছেলেদের প্রস্তুত করা হচ্ছে সেলসম্যান হিসেবে। ওদের কথা শিখানো হচ্ছে। পোশাকে পরিবর্তন আনা হয়েছে, আচার ব্যবহার সেখানো হচ্ছে। ভদ্রতা, নম্রতার উপর ওদের বিভিন্ন কথা বলা হচ্ছে এবং একটু-একটু করে ওদের

www.banglainternet.com

পরিবর্তন সবারই চোখে পড়ছে। ওরাই ঘুরে-ঘুরে মাল বিক্রি করবে বিভিন্ন দোকানে-দোকানে।

রুদ্রর কাছে বসলো ইরা। বলল, সত্যি দারুণ হয়েছে লেখাটা।

ইরার চোখে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রুদ্র বলল, এখনি এতো খুশি হবার কোনো কারণ নেই, সম্মুখে অন্ধকার।

তাতে ভয়ের কি আছে? সে তো আমাদের জানা।

ভয় পাচ্ছি না।

তবে?

যদি দেখা যেতো দলে-দলে মানুষ এভাবে কাজ করে যাচ্ছে তাহলে মনটা খুশিতে ভরে যেতো।

শুরু হয়ে গেছে রুদ্র।

উচ্ছ্বাসে ইরার হাত ধরে রুদ্র বলল, সত্যি ইরা?

কিছুটা আড়ষ্ট হয়ে এদিক-ওদিক তাকালো ইরা। তারপর বলল, সত্যি। এই এতোগুলো লোক কাজ করছে এক সাথে। অপেক্ষা করছে অনেকেই। এই তো আপনার বিপ্লব রুদ্র। আপনি তো তাই চেয়েছিলেন।

রুদ্রর চোখে ভেসে ওঠে একটি সুন্দর ছবি। সবাই কাজ করছে, কেউ কারো অনিষ্ট করার জন্য বসে থাকে না। না খেয়ে মরছে না কোনো মানুষ। রুদ্র বলল, আমাদের যেতে হবে ইরা, যেতে হবে বহু দূর।

এতো সব কর্ম-ব্যস্ততার মধ্যেও নেমে আসে অন্তরের ব্যাকুলতা। দিনের আলো নিভে যেতেই মৃত্তিকার উষ্ণ অন্ধ-গহ্বর থেকে উদ্‌গত অসহ্য অমানবিক দুঃখ আর হারানোর বেদনা যেন তীব্র হাহাকারে মেতে ওঠে শরীরের রন্ধ্রে-রন্ধ্রে। এ যেন কোনো দুর্লভ আত্মহত্যার অবয়ব।

রাতের গভীরে মিহি সুরে কাঁদেন মা। সে যে কতটা করুণ, কতটা বেদনাক্ত, কতটা অন্তরগ্রাসী তা বলে বোঝাতে পারে না রুদ্র। মায়ের কাছ থেকে দূরে গিয়ে অঝরে কাঁদতে থাকে। পাষাণ লোকটার আর কোনো খবর পাওয়া গেল না। সে কেমন আছে? কোথায় আছে? বেঁচে আছে, না কি মরে গেছে? এই জীবনে অপেক্ষার আর শেষ হবে না মায়ের। সে তার স্বামীর জন্য এখনো অপেক্ষা করে আছে চোখে জল নিয়ে। সে কি আসবে? হয়তো, হয়তো না। তবুও চলবে এই প্রতীক্ষার প্রহর। স্তিমিত হবে আকাশ। মহাকালের ডঙ্কা বাজিয়ে উঠবে তুফান। এ যেন মহা এক তূর্য, মহাজাগতিক খেলার নেশায় বিভোর চরাচর। সবই যেন ম্লান মায়ের অন্তরের সর্বগ্রাসী ঝঞ্ঝার কাছে। তার দৃষ্টি সেই পথে, যে পথে চলে গেছে তার... হু-হু করে

কেঁদে উঠলো রুদ্র। মানুষ কেন এতোটা অবুঝ হয়। হয়তো সৃষ্টির অসীম রহস্য। সংসারে কত শত নবী রাসুল, মহাপুরুষ এসেছেন ধর্ম প্রচারে, মিথ্যেকে বাদ দিয়ে সত্যের কথা বলতে। কিন্তু মানুষ কি তাদের কথা শুনছে? মোটেই না। মানুষ যেন চিরকালই বিপথে চলতে ভালোবাসে।

চুমকি এখনো ব্যাকুল তৃষিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে রুদ্রর দিকে। সে তার দেহের ক্ষুধা নিবারণে বিয়ে করেছে কালাকে। এক সাথে রাত্রি যাপন করে তারা। হয়তো মধুর দু-চারটি কথাও হয় শিৎকারে-শিৎকারে। পেটের পটে ছবি আঁকতে হয়তো দু'জনে দু'জনের পাঁজর চূর্ণ করে মধ্য রাতে।

কিন্তু রুদ্র তার কাছে দেবতা। জৈবিক মাতন তুলে শরীরের ক্ষুধা মিটে গেলেই যেন শুরু হয় মনে হুতাশন। অন্তর জ্বলে, চোখে জল আসতে চায়। যত্রতত্র রুদ্রদের ঘরে ছুটে আসে চুমকি। মায়ের সাথে গল্প করে। তারপর কখন যেন চলে আসে রুদ্রর ঘরে। কখনো সম্মোহকের দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে দীর্ঘক্ষণ। আবার কখনো রঙ্গময়ীর মতো এলোচুলে ভুবন ভোলানো হসি হাসে। অস্ফুট ঠোঁটে বলে, তোমাকে দেখার সাধ কখনোই মিটবে না আমার। তারপর রুদ্রর পায়ের কাছে বসে উদাস অথচ ব্যাকুল কণ্ঠে বলে, এই বস্তি ছেড়ে তুমি চলে যাবে না তো কখনো?

গেলে? প্রশ্ন নয়, জানার আগ্রহ রুদ্রর কণ্ঠে।

দীর্ঘ নিঃশ্বাসে-নিঃশ্বাসে ভরে উঠে ছোট্ট কুটির। উত্তর না দিয়ে চুমকি আবার বলে, মেয়েটি বড় ভালো।

কোন মেয়েটি?

ইরা, তোমার কাছে আসে। কত বড়লোকের মেয়ে। অনেক পড়ালেখা জানে তাই না। সে তোমাকে খুব ভালোবাসে।

তোমাকে বলেছে?

বলতে হবে কেন? বোঝা যায়। তারপর জালানায় দৃষ্টি রেখে বলে, তুমি অবশ্য কিছুই বুঝতে চাও না। আমি তো না হয় খারাপ মেয়ে, কিন্তু তাকে ফেলে দিও না। তোমাকে একা দেখলে বড় কষ্ট হয়। আঁচলে চোখ মোছে চুমকি।

চুমকির জন্য বুকের ভেতরটা কেমন করে ওঠে রুদ্রর। এই ভালোবাসার প্রতিদান কি করে দেবে সে। আজ যেন মনে হয় চুমকি তার গত জনমের সাথি। মুহূর্তেই খচ করে উঠলো বুকের ভেতর। তাহলে ইরা কে? কে যেন বলে যায়, ইরা তার জনম-জনমের সাথি। সময়ের মতো। যার আদি-অন্ত কিছুই নেই।

www.banglainternet.com

প্রতি প্রভাতেই এখন ঘুম ভাঙে ঘুণ্টিঘরের মানুষেরা। কাজে ব্যস্ত হয় তারা। সময়টাকে যেন বদলে দিয়েছে এখানকার সবাই মিলে। শুধুমাত্র জীর্ণ ঝুপড়িগুলো ছাড়া আর কিছুই নেই আগের মতো। সকাল হলেই সেই অশ্রাব্য শব্দগুলো শোনা যায় না। শোনা যায় কচি-কচি মুখে আরবি আর বাংলা উচ্চারণ। সূর্য উঠার সাথে-সাথেই বুকের হাড় বের করা রোগা কালো মানুষগুলো এখন আর ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে যায় না মিল, কল-কারখানায়।

আবার সন্ধ্যা হলেই ফিরতে হয় না এক বুক হতাশা নিয়ে। আজ কাজ মেলেনি, বেতন হয়নি। সম্রাটের মদের দোকানে বসে বিরামহীন মাল খেয়ে ঘরে গিয়ে রাজ্যের সব রাগ বৌয়ের পিঠের উপর। নীরবে দেহ বিক্রি করতে যাওয়া মেয়েগুলো আর সাজগোজ করে না সন্ধ্যা হলেই। কালা, বুলেট ওরা অস্ত্র চালানোর কথা ভাবে না। ধলুর চায়ের দোকানে বসে না মদের আড্ডা। নগদ কারবারের লাভ দিয়ে চলছে বস্তি।

রুদ্র তাকিয়ে থাকে। ওর চোখের সম্মুখে ভেসে ওঠে একটি দেশ। এ তো শুধু ঘুণ্টিঘর নয়, পুরো দেশটা। সবাই যেন কাজ করছে। কেউ কারো ক্ষতি করছে না। নিপীড়িত অসহায় মানুষগুলোকে না খেয়ে মরতে হচ্ছে না। একজন অন্যজনের সাহায্যে হাত বাড়িয়ে দিচ্ছে। রোদেলা কোনো দুপুরে একসাথে মিলেমিশে কাজ করছে চুমকি আর ইরা। কারো মধ্যে যেন কোনো ভেদাভেদ নেই। যার যতটা সাধ্য আছে, সেই যেন করবে ততটা।

ইরা এসে বসলো রুদ্রর পাশে। ঠোঁটে হাসি। রোদের তীব্রতায় মুখ লোহিত বর্ণ, বিন্দু-বিন্দু ঘাম ঝরছে মুখে। তবুও চোখের তারায় অসীম আনন্দ। ইরা বলল, আজ সকাল থেকে কিছুই খাওয়া হয়নি আপনার।

কে বলল?

মা। মন খারাপ?

আপনি রোদে গিয়ে ঘেমে গেছেন?

সেটা আমার প্রশ্নের উত্তর হলো?

হলো না। কিন্তু মন খারাপ কি না বুঝতে পারছি না।

কি হয়েছে?

কিছুই হয়নি। অকারণেই বিষাদে ভরে আছে অন্তর।

আমার চোখে তাকিয়ে দেখেন আনন্দ পান কিনা।

রুদ্র তাকালো ইরার চোখে। তারপর বলল, আপনার চোখে যে সীমাহীন আলো।

সে আপনারই দান রুদ্র।

আমার?

হ্যাঁ।

কেমন করে? কেঁপে-কেঁপে ওঠে রুদ্রর কণ্ঠ।

রুদ্রর হাত ধরে ইরা বলে, সে আপনি বুঝবেন না। যে প্রদীপ জ্বলে দূর করে অন্ধকার, সে কখনো খোঁজ রাখে না নিজের বুকে কত আলো।

আপনি মিথ্যে বলছেন ইরা।

মোটেও না।

আমি বস্তির ছেলে, পথে-পথে মানুষ।

সে আপনার সৌভাগ্য। জীবনের অনেকটা আপন হতে পেরেছেন।

কিন্তু কেনো মনে হয়, আমি বড় অপূর্ণ।

সে তো আমাদের সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি।

জ্বলজ্বল করে ওঠে ইরার চোখ। দু'টি অতিউজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। ভয়ে যেন সঙ্কুচিত হতে থাকে রুদ্র। আবার যেন তুড়ি বাজে বুকের ভেতর। পাগলা ঘোড়ার মতো ছুটতে থাকে মন। রুদ্র আবার বলে ওঠে, এতো আলো কোথায় পেলেন?

ইরার মুখে হাসি। যেন স্বর্গ থেকে আসা। বলল, আপনার কাছ থেকে পেয়েছি।

আমাকে একটু দেবেন?

হাত বাড়িয়ে রুদ্রর হাত ধরে ইরা বলল, সবটাই আপনার রইল। ইচ্ছে মতোই নিয়ে নেবেন।

রুদ্র হাসল। তারপর দূরে তাকিয়ে বলল, আমাকে যেতে হবে দূর বহু দূরের ঐ সূর্যের কাছে।

আমি আপনার সাথে যাব।

যাবেন তো?

সত্যিই যাব। পৃথিবীর সকল সংস্কার ভেঙে যাব। আপনার হাতে হাত রেখে যাব সভ্যতার কাছে। দৃঢ় আর মুক্ত পদে।

www.banglainternet.com